প্রয়াত মাতা-পিতা

সুপ্রভা চৌধুরী ও বিধুভূষণ চৌধুরীর

স্মৃতির উদ্দেশে সমর্পিত

নিবেদন

আপাতবিচ্ছিন্ন চারটি আলোচনাকে একই বইয়ে সংকলিত করার পিছনে যে-যুক্তিটি কাজ করেছে তা এই যে আলোচনাগুলি একই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে রচিত এবং মূলগত একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। চারটি রচনাই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় অপরিবর্তিত আকারেই সেগুলি ছাপা হলো। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তি, তথ্য বা উক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে—রচনাগুলির স্বতন্ত্র পাঠযোগ্যতা বজায় রাখার প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবেই ঐ ত্রুটির সংশোধন করা হয়নি। প্রথম তিনটি রচনার প্রারম্ভিক উপাদান কিংবদন্তী, চতুর্থ রচনার ক্ষেত্রে (প্রাচীন ভারতে মাতৃগোত্র) সেই সাধারণ লক্ষণের সামান্য ব্যতিক্রম ঘটেছে—তা-বলে এটিকে দলছুট ভাবার কোনো কারণ নেই। প্রথমত, সাবিত্রী-উপাখ্যানে বরলব্ধ সন্তানদের মাতৃনামে খ্যাত হওয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, তা-ই আমাকে মাতৃগোত্র সম্পর্কে অনুসন্ধানে আগ্রহী করেছিল। সে-বিচারে এটি সাবিত্রী-বিষয়ক আলোচনারই পরিপূরক। দ্বিতীয়ত, কিংবদন্তীর সূত্র ধরে মাতৃ-প্রাধান্যের যে ইঙ্গিতগুলি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছি, ইতিহাসের কিছু কিছু সাধুরে উপাদানও যে সেগুলির অনুকূল সামাজিক অবয়বের অস্তিত্বের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, আমার প্রতিপাদ্যের স্বার্থেই সেটা দেখানোর প্রয়োজন ছিল।

বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধানের পেছনে প্রারম্ভিক প্রেরণা ছিল নিজের অঞ্চল ও তার মানুষকে জানার আগ্রহ, কোনোরূপ জ্ঞানস্পৃহা নয়। সতর্ক পাঠক অনায়াসে লক্ষ করবেন যে সমাজবিজ্ঞান-চর্চায় অধুনা যে-সমস্ত পদ্ধতি, প্রকরণ এবং আদর্শ ব্যবহৃত হয়, সেগুলির প্রয়োগ ও আরোপণ আমার আলোচনায় প্রায় অনুপস্থিত। তার প্রধান কারণ এই যে, অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নিত্যনূতন যে-সমস্ত চিন্তা-চেতনার সঞ্চার ঘটছে, সেগুলি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম। পরবর্তীকালে যখন সেগুলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সচেতন হওয়ার সুযোগ ঘটেছে, ততদিনে আলোচ্য বিষয় নিয়ে আমারও কিছু নিজস্ব ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে গেছে এবং সেগুলি যে সর্বথা পরিত্যাজ্য, এমন বোধ করিনি।

বইটির আয়তন ক্ষুদ্র, কিন্তু বহুজনের সাহায্যে ব্যতীত এটুকুও সম্ভব হতো না। অগ্রজপ্রতিম মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্ধুবর দেবেশ রায় রচনাগুলির সূচনাপর্ব

থেকেই উৎসাহ জুগিয়ে আসছেন, এ পর্যায়ের প্রথম রচনাটি দেবেশবাবুর সম্পাদনাধীন 'পরিচয়'তেই ছাপা হয়েছিল। 'বারোমাস' সম্পাদক অশোক সেন শুধু উৎসাহ-ই দেননি, পরবর্তী দুটি রচনা আগ্রহ সহকারে 'বারোমাস'-এ ছেপেছেন। স্বপ্না দেব ও পূর্ণেন্দু পত্রী চতুর্থ রচনাটি সংস্কৃতি সংখ্যা 'প্রতিক্ষণ'-এ প্রকাশ করেছিলেন। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। অনুজপ্রতিম বাহারুদ্দিন অনবরত তাগাদা না দিলে লেখাগুলি আদৌ হতো না। বিষয়গুলি নিয়ে প্রথমে ইংরেজিতেই লেখার কথা ভেবেছিলাম, কবি শঙ্খ ঘোষই বাংলায় লিখতে উপদেশ দেন। অনুজপ্রতিম ড. বাণীপ্রসন্ন মিশ্র শুধু তথ্যসংগ্রহের সুযোগই অবারিত করে দেননি, প্রাসঙ্গিক বহু বিষয় সম্পর্কেও আমাকে অবহিত করেছেন। তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য-বিশ্লেষণে অহরহ সাহায্য করেছেন রানা দেব (করিমগঞ্জ), অধ্যাপক মাণিক সাহা ও অধ্যাপক মনোজ চক্রবর্তী। অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী অধ্যাপক বিকাশ দাস আমার সমস্ত কাজকর্মেই নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে থাকেন। এ-বইটির প্রকাশের ব্যাপারে তিনিই বিশেষ উদ্যম নিয়েছিলেন। এঁদের সকলের কাছেই আমার ঋণ অপরিশোধ্য। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি করিমগঞ্জের হোলসেল কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলী ও সাধারণ সভ্যদের, তাঁরা আগ্রহী না হলে এ-বইয়ের প্রকাশ হয়তো বিলম্বিত হতো।

গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশনার জগতে প্যাপিরাস একটি সুপরিচিত নাম। এ-বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় অরিজিৎ কুমারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সূচি

সাবিত্রী-সত্যবান : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার

সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানটি সমগ্র ভারতবর্ষেই সুপ্রচলিত জনপ্রিয়। পতিব্রতা নারীর চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা হিসাবেই সাবিত্রী স্বীকৃত। ঐ উপাখ্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি মেয়েলি ব্রত-উদযাপনের উল্লেখ মহাভারতেই রয়েছে : "ব্রত ত্রিরাত্রিমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাহ ভবৎ" (২৯০/৩)। এককালে নিশ্চিতই ব্রতটি খুবই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু যুগপ্রভাবে সাম্প্রতিককালে তার প্রসারবৃত্তের সংকোচন ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হোমিওপ্যাথি' গল্পে সাবিত্রীব্রতের অনুষ্ঠানকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ইদানিং সাবিত্রীব্রত পশ্চিমবঙ্গে আচরিত হয় না বললেই চলে। বৃহত্তর বঙ্গের পূর্বপ্রত্যন্ত অঞ্চল শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় কিন্তু সাবিত্রীব্রত একটি অতীব জনপ্রিয় মেয়েলি আচার, বিশেষত বর্ণহিন্দুদের মধ্যে। সধবারা সবাই সম্ভবপর ক্ষেত্রে ব্রতটি পালনে আগ্রহী। বিবাহের প্রথম বছরে নববধূর পক্ষে তো এটা একটা অবশ্যপালনীয় আচার।

মেয়েলি ব্রতগুলির সাধারণভাবেই দুটো দিক থাকে, একটা তার বিশ্বাসগত দিক, অপরটা আচারগত। ব্রতধারিণীদের সঙ্গে আলাপ করলে দেখা যায় যে সাবিত্রীব্রতের বিশ্বাসগত দিকটা পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাবিত্রীর প্রয়াসে মৃত স্বামী পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন এবং যমরাজা তাঁকে শত-পুত্রবতী হওয়ার বর দিয়েছিলেন, অতএব স্বামীর মঙ্গল এবং সন্তানকামনাই ব্রতপালনের ঘোষিত লক্ষ্য। মেয়েরা মুখে মুখে যে ব্রতকথা বলেন, তার সঙ্গেও মহাভারতের কাহিনীর কোনো অমিল নেই, শুধু মেয়েরা একটি বাড়তি তথ্য যোগ করেন। বলা হয় যে যমালয় থেকে স্বামীসহ প্রত্যাবর্তনের সময়ে সাবিত্রী নাকি পথিপার্শ্বস্থ সমস্ত বলদের জোয়াল খুলে দিয়ে এসেছিলেন। তথ্যটি একটু আকস্মিক ঠেকে, কাহিনীর মূল কাঠামোর সঙ্গে এই সংযোজনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে। বিশ্বাসগত দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি সাবিত্রীব্রতের সঙ্গে যে রীতিনীতি ও আচরণবিধি আবশ্যিকভাবেই পালনীয় বলে মেনে নেওয়া হয়, সেগুলোর দিকে দৃকপাত করি, তাহলে দেখব যে কাহিনীর সঙ্গে ব্রতের আচারগত দিকগুলির বৈসাদৃশ্য আরো প্রকট। বিষয়টি নিয়ে আরো ব্যাপক পর্যালোচনার অবকাশ তখনই সৃষ্টি হয়।

শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে সাবিত্রীব্রত প্রতিপালনের সঙ্গে কী-সমস্ত আচারবিধি

প্রচলিত, আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে তার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে ব্রতটি শুরু হয়, তিনদিন ধরে চলে। এটা মহাভারতেরই বিধি ; ব্রত-সমাপ্তি ঘটে অমাবস্যা তিথিতে। বাড়ির প্রাঙ্গণে অথবা খোলা বারান্দায় তৈরি করা হয় মৃত্তিকানির্মিত বেদী, তার চারকোণে চারটি বটগাছের ডাল পোঁতা হয় খুঁটির মতো, লালসুতো সাতবার ঘুরিয়ে খুঁটিগুলিকে বেষ্টন করা হয়। সুতোর মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বটের পাতা, বেদীটি তখন পরিণত হয় অরণ্যের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিরূপে। একটি বটের পাতায় সিঁদুর দিয়ে সাবিত্রী এবং আরেকটি পাতায় পিটুলি দিয়ে আঁকা হয় সত্যবান। দুটো চিত্রকে বেদীর দুইপাশে রেখে মধ্যে কয়লা দিয়ে আঁকা হয় যমরাজার প্রতিমূর্তি। বেদীর উপরে থাকে একটি ছোট কাপড়ের পুঁটলি, তার ভেতরে থাকবে ১০৮টি ধান। পুঁটলিটিকে বলা হয় 'বাপা'। ঐ ধান কিন্তু লাঙলকর্ষিত জমির ধান হলে চলবে না। এ-ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অ-রোয়া (স্থানীয় ভাষায় 'ধরা' বা 'আছড়া') ধান। অর্থাৎ মাঠের ফসল তোলার সময়ে খেতের আশেপাশের আলে অথবা অন্য জায়গায় যে ধানগুলো অনবধানতাবশত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, সে-ধান থেকে যে চারা উঠবে, তার ধান সংগ্রহ করে রাখা হয় ঐ সময়ে ব্যবহারের জন্য। অভাবে পাহাড়ী জুমখেতের ধান দিয়েও চালানো হয়। কারণ জুমচাষে লাঙল ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় খুন্তজাতীয় জিনিস। নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হয় পাঁচ রকমের ফল, পান-সুপারি, দুধ ইত্যাদি। এ-ক্ষেত্রেও লাঙলকর্ষিত জমির ফলমূল ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মেয়েরা নিজেরাই পূজার কাজগুলি নিষ্পন্ন করেন। ইদানীং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণপুরোহিতও ডাকা হয়, কিন্তু তার ভূমিকা থাকে নিতান্তই গৌণ। মূল কাজগুলি মেয়েরাই করেন, ব্রতকথা তাঁরাই বলেন ; তিনদিনের অনুষ্ঠান মোটামুটি একই আচারের পুনরাবৃত্তি ; চতুর্থদিনে ব্রত অন্তে কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে। ভোরবেলা ব্রতধারিণী ও তাঁর স্বামী স্নান করবেন ; স্বামী দাঁড়াবেন বেদীর সামনে স্বতন্ত্র একটি আসনে, ব্রতধারিণী তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করবেন। অতঃপর কাপড়ের পুঁটলিতে বাঁধা ১০৮টি ধান থেকে চাল বের করে স্বামীকে খেতে হবে। ঐ দিনই বাড়ির কৃষক-মুনিষ, অভাবে যে-কোনো কৃষক নিয়ে আসবে কাঁধে জোয়াল-লাঙল বাঁধা একজোড়া বলদ, ব্রতধারিণী সাতবার জোয়ালের বাঁধন খুলে দেওয়ার পরই ব্রতসমাপ্তি ঘটবে আনুষ্ঠানিকভাবে।

ব্রতধারিণীকে কিছু বাধানিষেধ (Tabu) পালন করতে হয় ব্রতের তিনদিন।

চাল-গম ইত্যাদি শস্যজাত কোনো খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ এক দিন, নিষিদ্ধ লাঙলে উৎপন্ন কোনো ফলমূল গ্রহণও। সমস্ত দিন উপবাসের পর দিনান্তে ব্রতধারিণী ফল ও দুধ খাবেন। এ-তিনদিন স্বামী-সহবাসও নিষিদ্ধ। ব্রতের তিনদিন চাষীরা মাঠে লাঙল টানবে না। চতুর্থ দিনে স্বামীবরণের পর মধ্যাহ্ন আহারে মৎস্যভক্ষণ ব্রতধারিণীর পক্ষে বাধ্যতামূলক। বিয়ের প্রথম বছরে কোনো এয়োতি যদি কোনো কারণে ব্রতধারণ করতে না পারেন, তবে পরবর্তী বছরে তিনি একা ব্রতপালন করতে পারবেন না। অন্য কোনো নবোঢ়া বধূর সঙ্গে মিলেই শুধু তা করা সম্ভব।

২

দেখা যাচ্ছে মহাভারত-কথিত একটি কাহিনী যদিও ব্রতের পটভূমি রচনা করেছে, কিন্তু ব্রতের আচারগত দিকটার একটা বড়ো অংশই জুড়ে রয়েছে কিছু কৃষিজাত সামগ্রী এবং কৃষিসংক্রান্ত আচার। বাধা নিষেধও কিছু কিছু কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। কেন এমনটি হলো? মহাভারতের কাহিনীতে কৃষির উল্লেখমাত্র নেই, বনবাসী রাজপুত্র আর তপস্বিনী-প্রায় রাজকন্যার শুচিস্নিগ্ধ দাম্পত্যপ্রণয়ই তার উপজীব্য। যে ব্রতের পটভূমিতে রয়েছে এমন কাহিনী, কাদাজল-মাখা কৃষিকাজের সংস্রব তার সঙ্গে কেমন করে এবং কেনই বা ঘটল। যেমন ফ্রেজার বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন, "Myth and ritual mutual explain and confirm each other".[১] আলোচ্যক্ষেত্রে কিন্তু উপাখ্যান এবং ধর্মাচার (ritual) একে অন্যের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণে আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোনো সাহায্য করছে না।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সমজাতীয় প্রাচীন উপাখ্যান এবং তাদের সঙ্গে জড়িত ধর্মাচারগুলি একটু তুলনায় দেখলে কিন্তু পুরো পরিপ্রেক্ষিতটাই পাল্টে যায়। মিশর, পশ্চিম এশিয়া এবং গ্রীসের পুরাণ কাহিনীতে দেবতার মৃত্যু এবং পুনরুজ্জীবনের অনেকগুলি কাহিনী রয়েছে, সঙ্গে জড়িত রয়েছে কিছু ধর্মাচারও। সেগুলো কিন্তু সবই একটা বিশিষ্ট ছকের (pattern) মধ্যে পড়ে যায়। দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত দেবতার প্রাণ ফিরে এসেছে তাঁর প্রিয়া কিংবা অন্য কোনো প্রিয়জনের চেষ্টায়। প্রাচীন মিশরীয় পুরাণে আমরা পাচ্ছি ওসিরিস ও আইসিস-এর কাহিনী। ওসিরিস নিহত হয়েছিলেন তাঁর ভাই সেট (Seth)-এর হাতে, তিনি প্রাণ ফিরে পান তাঁর ভগিনী তথা স্ত্রী আইসিস-এর চেষ্টায়।[২]

সুমেরীয়[৩] ও ব্যাবিলনিয়ার[৪] পুরাণ কাহিনীতে পাই তম্মুজকে (অন্য নাম দোমুজি), যার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ইশতার নেমে যান মৃত্যুপুরী পাতালের অন্তরালে; পৃথিবীতে তখন অজন্মা নেমে আসে, শস্যহীন বৃক্ষহীন বসুন্ধরায় নামে দুর্ভিক্ষ। ইশতার যখন তম্মুজকে আবার মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনেন, শুধুমাত্র তখনই আবার পৃথিবী ফলে ফুলে ভরে ওঠে। গ্রীকপুরাণে পাচ্ছি ডিমিটার আর পার্সিফনির গল্প।[৫] সেখানে অবশ্য এদের সম্পর্ক মা ও মেয়ের। পার্সিফনি গিয়েছিলেন বাগিচায় ফুল তুলতে, পাতালপুরীর রাজা হেডিস তাঁকে চুরি করে নিয়ে যায়। ডিমিটারের অভাববোধেই পরিপুষ্ট হতো পৃথিবীর বৃক্ষলতাপাতা। সেগুলি শুকিয়ে ঝরে পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত জিউসের হস্তক্ষেপে ঠিক হয় যে পার্সিফনি প্রতি বছর ছ'মাসের জন্য ফিরে আসবেন মাতা ডিমিটারের কাছে। ফ্রিজিয়ার পুরাণকাহিনীতে আছে যে প্রকৃতিদেবী সিবিলি স্বামী অ্যাটিস-এর মৃত্যুতে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং প্রকৃতির রাজ্যে নেমে আসে দুর্যোগ।[৬] পৃথিবীতে বসন্তের পুনরাবির্ভাব ঘটে অ্যাটিসের পুনর্জীবন লাভের পর। গ্রীক-প্রভাবিত সিরিয়ায় পাই অ্যাডোনিসের মৃত্যুতে শোকাতুরা আফ্রোদিতির কাহিনী। সেখানকার মিস্টিক নাটকে সেই মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কাহিনী অভিনীত হতো।[৭] অপর গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাসও মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত।[৮] প্যালেস্টাইনের রাসশামরা প্রত্নলিপিতে কানানাইটদের দেবতা বাল এবং দেবী আনাথ এমনই আরেক কাহিনীর নায়ক এবং নায়িকা।[৯] এ-কাহিনীগুলির নানা ধরনের রূপান্তর ও পাঠান্তর রয়েছে এবং এ-রকম কাহিনীও অন্য অনেক রয়েছে। মূল উপাদান সবগুলোরই মোটামুটি এক।

পণ্ডিতজনেরা সকলেই একমত যে মৃত দেবতার পুনর্জীবন লাভের এই কাহিনীগুলির বিশিষ্ট ও আবশ্যিক উপাদানগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে প্রকৃতি জগৎ থেকে। পুনরুজ্জীবিত এই সমস্ত দেবতা হচ্ছেন উদ্ভিদ-প্রাণ (vegetation spirit) অথবা শস্য-প্রাণের (corn spirit) প্রতীক। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিবর্তনের প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে খাদ্য-সংগ্রহের যুগে (food-gathering stage) যাকে ভাবা হতো উদ্ভিদ-প্রাণ, কৃষি-আবিষ্কারের পর তাকেই ধরে নেওয়া হলো শস্যপ্রাণ হিসাবে। আরেকটু পরের পর্যায়ে শস্য-প্রাণ আবার পরিণত হয়েছেন শস্যদেবতায় (corn god)। ফ্রেজার বলেছেন, "Under the names of Osiris, Tammuz, Adonis and Attis, the people of Egypt and Western Asia represented the yearly decay and revival of life, especially of vegetable life, which they personified as a god who

died and rose again."[১০] অর্থাৎ উদ্ভিদজগতের সাংবৎসরিক ক্ষয় এবং পুনরায় তার নবপল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠা (সেই সঙ্গে কর্তিত শস্যের পুনরুজ্জীবন)—প্রকৃতি ও শস্যজগতের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াই এই সমস্ত কাহিনীর জন্ম দিয়েছে।

উদ্ভিদজগৎ ও ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে মানুষের প্রাণধারণের মৌলিক প্রয়োজনের। আদিকাল থেকেই মানুষ চেষ্টা করেছে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে, যাতে প্রকৃতির আচরণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, যথাসময়ে বর্ষণ হয়, পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় সূর্যকিরণ, ফসল উৎপাদন যাতে হয় নির্বিঘ্ন। সেই নিয়ন্ত্রণেচ্ছা থেকে জন্ম হলো আচারভিত্তিক যাদুক্রিয়া বা ritual magic-এর, যার পরিণত ও পরিশীলিত রূপটিই আজ ধর্ম হিসাবে আচরিত হয়। শস্যপ্রাণের প্রতীক এই সমস্ত পুনরুজ্জীবিত দেবতাকে কেন্দ্র করে সেই কারণেই গড়ে উঠেছিল কতকগুলি ধর্মাচার, যার আদি উদ্দেশ্য ছিল জমির উর্বরতা ও ফসল উৎপাদনের বৃদ্ধি। পরবর্তীকালে এই ধারণার সম্প্রসারণ ঘটে এবং এই সমস্ত ধর্মাচারের সঙ্গে জীব ও মানুষের প্রজনন ক্ষমতার বৃদ্ধির ব্যাপারটিও জড়িত হয়ে পড়ে। যাই হোক, আমরা যে শস্যদেবতার কথা উল্লেখ করেছি, তাদের কেন্দ্র করে যে-সমস্ত যাদু অনুষ্ঠান ও লোকবিশ্বাস (folk belief) গড়ে উঠেছিল, সে-সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। তথ্যগুলি নেওয়া হয়েছে ফ্রেজারের *Golden Bough* থেকে।[১১]

জানা যায়, এ্যাডোনিসের উৎসবের সময়ে মেয়েরা শস্যচূর্ণ থেকে তৈরি করা কোনো খাবার খেত না ('women eat nothing which has been ground in a mill')। সিবিলি দেবীর পূজারিণীরা রুটি বা এ জাতীয় জিনিস খেতেন দেবীর উৎসবের সময়ে। কারণ হিসাবে বলা হতো যে শোকাহতা সিবিলি স্বামীর মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভের মধ্যবর্তী সময়টাতে উপবাসী ছিলেন। ওসিরিস সম্পর্কে বলা হতো যে তিনিই মিশরে লাঙলের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, এবং তার পূজার সময়টাতে দুটো বলদকে আনুষ্ঠানিকভাবে জোয়ালে আবদ্ধ করা হতো। শস্যচূর্ণের সঙ্গে জল মিশিয়ে অর্থাৎ পিটুলি দিয়ে ওসিরিসের প্রতিকৃতিও আঁকা হতো। গ্রীক ডায়োনিসাস সম্পর্কে বলা হয় যে তিনিই সর্বপ্রথম বলদের কাঁধে জোয়াল-লাঙল তুলে দেন। থেসমো ফোরিয়ায় ডায়োনিসাসের যে উৎসব হতো, তাতে ডালিম খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বলা হতো ফলটি উৎপন্ন হয় নিহত দেবতার মৃতদেহ-নিঃসৃত রক্ত থেকে।

সংখ্যার বিচারে হয়তো খুব বেশি নয়, তবুও প্রীস্ট-কাছাড় অঞ্চলের সাবিত্রী-

ব্রতের আচারের সঙ্গে এই সমস্ত আচার ও লোকবিশ্বাসের এই যে সাদৃশ্য, রূপগত বিচারে তার গুরুত্ব কম নয়। নিশ্চয়ই এই সাদৃশ্যগুলিকে আপতিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবং এগুলো আরো অর্থবহ হয়ে ওঠে এবং সে-অর্থের সঙ্গে নূতন মাত্রাও যুক্ত হয় যখন দেখা যায় সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান ও তৎসংশ্লিষ্ট ধর্মাচারের সবই এই সমস্ত ধর্মাচারের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে একজন শোকাতুরা নারী ও একজন মৃত এবং পরবর্তীকালে পুনরুজ্জীবিত দেবতা। সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন যে সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে একই ধরনের পটভূমি স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডি পেরিয়ে একই ধরনের মানসিক ধ্যান-ধারণার জন্ম দেয়।[১২] সাবিত্রী-ব্রতের রহস্য নিরসনে এই সূত্রটির প্রয়োগ তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ওসিরিস-আইসিস, তম্মুজ-ইসথার বা সিবিল-আত্তিস-এর কাহিনী ও ধর্মাচারের সঙ্গে সাবিত্রী উপাখ্যান তথা ব্রতের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যটুকু দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এ সাদৃশ্য শুধু বহিরঙ্গের নয়, এর মধ্যে আরো মৌলিক কারণ বিদ্যমান। ফসল ও উর্বরতাশক্তির বৃদ্ধির যে-কামনা আইসিস-ইসথার-সিবিলির উৎসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সাবিত্রীব্রতও সেই একই ধরনের কারণসম্ভূত ধর্মাচার। সাবিত্রীর কাহিনীর সঙ্গে আপাত-সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও কৃষি সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি কেন সাবিত্রীব্রতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলো, তার পটভূমিও তখন স্পষ্টতর হয়। সাবিত্রীব্রতের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পরবর্তী অনেক ধ্যান-ধারণার প্রভাব রয়েছে, কিন্তু তার অন্তর্বস্তুর মধ্যে যে টিঁকে রয়েছে এদেশের মানুষের আদিম লোকবিশ্বাসের লুপ্তপ্রায় অবশেষ, সে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ তখন সহজসাধ্য নয়।

সিবিলি, ইসথার, আইসিস যেমন ছিলেন পৃথিবীর দেবায়ত রূপ বা ধরিত্রী দেবীর প্রতীক, সাবিত্রীকেও যদি তেমনই ধরিত্রী দেবীর (earth goddess) প্রতীক হিসাবে ধরে নেওয়া যায়, তবে সেই যুক্তিধারা অনুসরণ করে আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারি। সত্যবান এখানে তাহলে প্রতিনিধিত্ব করছেন উদ্ভিদ-প্রাণ বা শস্যপ্রাণের, তম্মুজ-ডায়োনিসাস-এ্যাডোনিসেরই ভারতীয় প্রতিরূপ তিনি। বটপাতা ও বৃক্ষডালের ব্যবহার থেকে মনে হয় তাঁর সৃষ্টি হয়েছিল উদ্ভিদ-প্রাণ হিসাবেই। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, এখানেও তেমনি পরবর্তী পর্যায়ে তিনি পরিণত হয়েছেন শস্যপ্রাণে এবং বিবর্তনের আরেকটু পরের পর্যায়ে শস্য-দেবতা বা corn god-এ তাঁর উত্তরণ ঘটেছে সেই একই প্রক্রিয়ায়। ধরিত্রী তাঁর নিজস্ব প্রয়াসেই শস্যের পুনরুজ্জীবন ঘটায়, তাই সত্যবানের পুনরুজ্জীবন সাবিত্রীর প্রয়াসেরই ফল। ফ্রেজারের মতে, আদিম কৃষিজীবীরা বিশ্বাস করত যে শস্যপ্রাণ

যখন মৃত, শস্যকণা তখন মৃতের রক্ত মাংসের সমতুল।[১৩] ব্রতধারিণীর পক্ষে শস্যভক্ষণ তাই নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কৃষিকাজও, কারণ নিহত শস্যপ্রাণ পুনর্জীবন লাভ না করা পর্যন্ত কৃষিকাজ নিষ্ফল। শস্যবীজপূর্ণ কাপড়ের পুঁটলি বা 'বানা' শস্যের প্রাণশক্তির ধারক, তাই পুনরুজ্জীবিত সত্যবানের প্রতিভূ হিসাবে ব্রত-ধারিণীর স্বামী নিজের প্রজননশক্তি বাড়িয়ে নেন শস্যবীজ গ্রহণের মাধ্যমে। এখানে এসেই শস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির কামনাটি অপত্য-উৎপাদন কামনার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী যে দাম্পত্য প্রণয়ের চরম পরাকাষ্ঠায় পরিণতি লাভ করল, এই সম্প্রসারিত বাসনার মধ্যেই তার সূত্রটি নিহিত। প্রজনন-শক্তিভিত্তিক যাদুবিশ্বাসের (fertility magic) ক্ষেত্রবিস্তারের এই ধরনের দৃষ্টান্ত প্রাচীন লোকবিশ্বাসে অনেক রয়েছে।[১৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শস্যপূর্ণ পুঁটলিটিকে যে 'বানা' বলা হয়, তাও একান্ত অকারণে নয়। অভিধানের মতে 'বানা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বণ্ড' শব্দ থেকে, যার একটি অর্থ পুরুষ-জননেন্দ্রিয়। সাবিত্রীব্রতে জোয়াল কাঁধে বলদের আনুষ্ঠানিক প্রবেশ কেন ঘটল, সে-প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব।

সাবিত্রীব্রতের সময়-নির্বাচনটিও লক্ষ্যণীয়। এদেশের স্বাভাবিক প্রধান শস্য শালিধান, জ্যৈষ্ঠমাসই তার বপনের উপযুক্ত সময়। শস্যের প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্য যে যাদু-সংশ্লিষ্ট ধর্মাচার আচরিত হবে, তার অনুষ্ঠানের জন্য জ্যৈষ্ঠ-মাসই যে উপযুক্ত বিবেচিত হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? ফ্রেজার জানাচ্ছেন যে ওসিরিসের উৎসবও মিশরে পালিত হতো কৃষক যখন বীজবপন করবে, ঠিক তার আগে।[১৫]

সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম কৃষিকাজকে খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। তাছাড়া উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যাদুভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর কৃষিকাজের যে পরনির্ভরতা ছিল, তারও অনেকখানিই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উপযোগিতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীব্রত তার ব্যবহারিক গুরুত্ব হারাল। কিন্তু স্বভাবত রক্ষণশীল অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যে অনুষ্ঠানটি টিঁকে রইল কিছুটা পরিপ্রেক্ষিত-ভ্রষ্ট অবস্থায়। এমনিভাবে টিঁকে রয়েছে আরো অনেক মেয়েলি আচারই তাদের আদিম প্রকরণ নিয়ে। অপরদিকে পুনরুজ্জীবিত দেবতা ও জীবনদাত্রী দেবীর কাহিনীটিও বিনষ্ট হলো না; কিন্তু যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্যুত হওয়ার সুযোগে তার সঙ্গেও যুক্ত হলো নতুন মাত্রা, নতুন ধ্যানধারণা ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীটি তার কৃষি-সংশ্লিষ্ট

সম্পূর্ণ পরিহার করে পরিণতি লাভ করল নরনারীর দাম্পত্য-প্রণয়ের এক মহান কাব্যগাথায়। এ-ধরনের রূপান্তর যে আলোচ্য ক্ষেত্রেই ঘটেছে, তা নয়, এটাও একটা প্যাটার্ন। অন্যান্য দেশের প্রাচীন ধর্মাচার-ভিত্তিক কাহিনী নিয়েও এমনটি ঘটেছে। অ্যাডোনিসের কাহিনীটি তার প্রমাণ। ই. এইচ. হুক এই প্যাটার্নটিকে চিহ্নিত করে বলেছেন, "It can be observed that rituals decayed and disappeared or were transformed with the decay of the civilization in which they had played such an important part. Then We find that the myths attached to the decaying rituals were freed from their ritual association and became literary forms.[১৩] কথাগুলি বলা হয়েছে মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার পুরাকাহিনীগুলির প্রসঙ্গে, কিন্তু সাবিত্রী-সত্যবানের আখ্যান সম্পর্কেও কথাগুলি সমভাবে প্রযোজ্য। আমাদের দেশেই এমনতরো রূপান্তরের চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বী তাঁর *Myth and Reality* গ্রন্থে। উর্বশী-পুরূরবার কাহিনীটি যে বৈদিক আদিম রূপ থেকে কালিদাসের কালে এসে আগাপাশতলা বদলে গেছে, তার বিভিন্ন পর্যায় তিনি নির্ণয় করেছেন।

৩

আলোচনার এই পর্যায়ে অনিবার্যভাবেই আরো একাধিক প্রশ্নের আমরা মুখোমুখি হচ্ছি। সেগুলো এক এক করে বিবেচনা করা যাক। প্রথমত, সাবিত্রী-ব্রতের আচারগত প্রকরণের মধ্যে লাঙলের সাহায্যে উৎপাদিত শস্য তথা সাধারণ-ভাবে হলকর্ষণ সম্পর্কে একটা সহজাত অনীহা আমরা অনায়াসে লক্ষ করি। যে ব্রতের মূল উদ্দেশ্য উর্বরতা-শক্তির বিকাশ এবং ফসল-উৎপাদনের উৎকর্ষসাধন, সেই ব্রতেই আবার হলকর্ষণ সম্পর্কে এমনি ধরনের বীতরাগের পরিচয় পাওয়া যায় কেন, এ-প্রশ্নের জবাব খোঁজা নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক। দেখা যাবে, আপাতদৃষ্টিতে যে-মনোভাবকে স্ববিরোধিতার দৃষ্টান্ত বলে মনে হচ্ছে, আদিম কৃষির জন্ম এবং ক্রমবিকাশের আলোকে বিশ্লেষণ করলে তাকে কিন্তু খুবই সঙ্গতপূর্ণ বলে বিবেচনা করা সম্ভব।

এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে আদিম কৃষির আবিষ্কার ঘটেছিল মেয়েদের হাতে। রবার্ট ব্রিফল্টের ভাষায়, "The art of cultivation has developed exclusively in the hands of woman."[১৭] সে-কারণে আদিম কৃষিভিত্তিক

সমাজে শস্য-সংক্রান্ত যাদুক্রিয়ায় মেয়েদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। মেয়েদের বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো সেই সমাজে এবং নারীর সন্তানধারণের ক্ষমতা ও জমির শস্য-উৎপাদনের ক্ষমতাকে একই ধরনের গুণের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হতো ("fecundity of women and fecundity of earth was regarded as one and the same quality)।[১৮] ফ্রেজার একজন রেড-ইণ্ডিয়ান সর্দারের উল্লেখ করেছিলেন, যিনি একজন মিশনারীকে খুব সহজ ভাষায় ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মেয়েরা সন্তানের জন্ম দেয়, তাই তারাই জানে কী করে ফসলের জন্ম দিতে হবে। তাই দেখা যায়, মেয়েরা যখন বীজ বোনে, শস্যের উৎপাদন তখন কয়েকগুণ বেড়ে যায়।[১৯] এই সূত্র ধরেই ব্রিফল্ট বলেছেন জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য যে-সমস্ত ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক অনুষ্ঠান করা হতো, সেগুলোকে মেয়েদের বিশেষ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় বলে মনে করা হতো। পরবর্তী-কালে যে-সমস্ত ধর্মাচারে মেয়েদের বিশেষ অধিকার রয়েছে বলে দেখা যায়, সেগুলো মূলত ঐ কৃষি-সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকার থেকেই মেয়েদের উপর বর্তেছে।[২০] এ থেকে অনায়াসে এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে সাবিত্রীব্রতের ব্রতধারিণীরা নিজেদের অজ্ঞাতেই আদিম সেই মহিলা-পুরোহিতের (priestess শব্দের ভালো কোনো বাংলা প্রতিশব্দ না থাকায় আমরা এখন থেকে ঐ অর্থে 'পূজারিণী' শব্দটি ব্যবহার করব) ভূমিকা পালন করছেন। তার একটি স্মারকও সম্ভবত ব্রতাচারে রয়েছে। বিবাহের প্রথম বছরে ব্রত উদযাপন করতে না পারলে সেই বধূ পরের বছরে অন্য একজন নবোঢ়াকে নিয়েই শুধু ব্রতধারণ করতে পারেন, একা সেই কাজে তার অধিকার থাকে না। এই নিষেধাজ্ঞায় মনে হয় ব্রতচারণের অধিকারের সঙ্গে এক ধরনের দীক্ষা বা initiation-এর ব্যাপার জড়িত রয়েছে। প্রথম বর্ষে আচারভ্রষ্ট হওয়ার পরে পুনরায় দীক্ষান্তেই সেই অধিকার অর্জন করা সম্ভব, এমন ইঙ্গিত আচারটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন। নবোঢ়ার ক্ষেত্রে সে-প্রশ্ন ওঠে না, সম্ভবত বিবাহকেই তার দীক্ষা বলে মেনে নেওয়া হয় এবং তার সাহচর্যে আচারভ্রষ্টাও পুনরায় সে-অধিকার অর্জন করে।

যাই হোক, ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই যে সম্মানের আসনটি মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তার মূলে ছিল কৃষিকাজে তাদের অগ্রণী ভূমিকা। W. Schmidt বলেছেন, "Here it was the women who showed themselves supreme ; they were not only the bearers of children, but also the chief producer of food. They made the earth valuable

and they became consequently its possessors. Thus they won both social power and prestige." (উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে Merlin Stone-এর *Paradise Papers* বই থেকে ।) লাঙলের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিপত্তির আসনটি কিন্তু টলে গেল। বলদ-লাঙলের ব্যবহার শারীরিক কারণেই মেয়েদের সাধ্যাতীত, তাই কৃষিকাজ ধীরে ধীরে চলে গেল দৈহিক বলে বলীয়ান পুরুষের আওতায়। সম্মানের স্বর্গ থেকে নারীর নির্বাসনের সেই হলো সূত্রপাত। এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে জর্জ টমসন মন্তব্য করেছেন যে বলদে টানা লাঙল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিকাজ চলে গেল পুরুষের আওতায়। আফ্রিকার যে-অংশগুলোতে লাঙলভিত্তিক চাষ একান্ত সাম্প্রতিককালে প্রচলিত হয়েছে, এ-ধরনের পরিবর্তন সেখানে এখনও ঘটছে।[১১] আমাদের দেশে আসামের উত্তর কাছাড় জেলায় ডিমাসা উপজাতির মধ্যে পুরুষ-প্রাধান্য ও নারী-প্রাধান্যের ব্যাপারটির এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। চারদিকের পুরুষপ্রধান সমাজের নিরন্তর চাপের ফলে পুরুষ-প্রাধান্য আসন করে নিচ্ছে, কিন্তু মাতৃ-প্রাধান্যের সামাজিক প্রতিরোধ এখনও পুরো ভেঙে পড়েনি। বিবাহাদি সামাজিক আচরণে মাতৃপ্রাধান্যের লক্ষণ এখনও পর্যন্ত সেখানে সুস্পষ্ট। কৃষিকাজে লাঙল-বলদের ব্যবহার কিন্তু সে-সমাজে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

লাঙলের ব্যবহার যে শুধু কৃষিকাজেই মেয়েদের অধিকারটুকু কেড়ে নিল, তাই নয়, তার সার্বিক ফল দাঁড়াল আরো সুদূরপ্রসারী। কৃষি উৎপাদনে এই বিপ্লবের ফলে মানুষের হাতে এলো উদ্বৃত্ত ফসল. তারপর পর্যায়ক্রমে সামাজিক যে সমস্ত বিবর্তন ঘটল, তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্-এর পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তিবিষয়ক অতি পরিচিত গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ বিধৃত। আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যটুকু হলো এই যে লাঙলের প্রচলনের ফলেই পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষপ্রাধান্য, নারীর অন্তঃপুরে নির্বাসন, সম্পদের উত্তরাধিকার, সে-উত্তরাধিকারীর পিতৃপরিচয় সুনিশ্চিত করার জন্য সতীত্বের নিগড় ইত্যাদি নারীস্বার্থের পরিপন্থী ধ্যানধারণা বিধিনিষেধের জন্ম হলো।

বলা বাহুল্য, সামাজিক এই পালাবদল একদিনে হয়নি, অবলীলায় অনায়াসেও নয়। মের্লিন স্টোন দেখিয়েছেন যে মিশর ও পশ্চিম এশিয়ায় এই পালাবদল সংঘাত, দ্বন্দ্ব, রক্তপাত ও নিপীড়নের কী বীভৎস পটভূমি তৈরি করেছিল।[১২] মিশরীয় ওসিরিস বা গ্রীক ডায়োনিসাস কৃষিক্ষেত্রে লাঙল ব্যবহারের আদি প্রবর্তক, এই যে লোকবিশ্বাস, তা সংশ্লিষ্ট কাহিনীতে পরবর্তীকালে সংযোজিত

হয়েছে। এই সংযোজন আসলে কৃষিতে নারীর অগ্রাধিকারের অবসান-পর্বের স্মারক।

অন্যান্য দেশে যা ঘটেছিল, আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটার কোনো কারণ নেই এবং ব্যতিক্রম ঘটেওনি। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন যে আমাদের দেশে মাতৃপ্রাধান্য প্রাক-বৈদিক যুগ থেকে যে বিশেষ মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাকে উচ্ছেদ করতেও নিশ্চিতই আনুপাতিকভাবেই প্রচণ্ড রকমের বলপ্রয়োগের প্রয়োজন পড়েছিল।[২৩] অর্থাৎ নারী-প্রাধান্যের অবসান ও পুরুষ-প্রাধান্যের সূচনা এবং বিকাশ এ-দেশেও দ্বন্দ্ব-সংঘাত বর্জিত ছিল না। পরশুরামের মাতৃহত্যা সম্ভবত তারই স্মারক। সাবিত্রীর উপাখ্যানে এই সংঘাতের ইঙ্গিতটুকুও পাওয়া যায় না, কিন্তু সাবিত্রীব্রতের আচারে সে-সংঘাতের রেশটুকু রয়ে গেছে। যে কৃষিযন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার নারীকে তার প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্যের আসন থেকে স্থানচ্যুত করেছিল, সেই লাঙলের প্রতি প্রাচীন নারীসমাজের একধরনের বিদ্বেষ-বীতরাগ সৃষ্ট হয়েছিল, এটাই সম্ভব। সেই মানসিকতার জের আজও কাটেনি। আজকের ব্রতধারিণী নিজের অজান্তেই সংঘাতের সেই ধ্বজাটি বয়ে চলেছেন— সাবিত্রীব্রতে তাই লাঙলপ্রসূত সামগ্রী সর্বথা পরিত্যাজ্য। এবং বলদের কাঁধের জোয়াল বারবার খুলে দিয়ে ব্রতধারিণী নারী আসলে পুরুষ-শাসিত সমাজের কঠোর নিগড় থেকে নিজেকেই মুক্ত করতে চান। যমালয় থেকে ফিরে আসার পথে সাবিত্রী পথিপার্শ্বের বলদগুলির জোয়াল খুলে দিয়ে এসেছিলেন, স্থানীয় লোকস্মৃতিতে মহাভারত-বহির্ভূত এই যে তথ্যটি এখন পর্যন্ত টিঁকে আছে, লাঙলবাহিত কৃষিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সমকালীন নারী-সমাজের প্রতিরোধ-চেতনার বার্তাটি এর মধ্যে অন্তর্লীন।[২৪]

৪

আমাদের বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যেই দ্বিতীয় যে-প্রশ্নটি স্বতোৎসারিত, তার পরিপ্রেক্ষিতটি প্রথমে স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন।

ফ্রেজার খুব বিস্তৃতভাবেই দেখিয়েছেন যে গ্রীস, মিশর বা পশ্চিম এশিয়ায় শস্যপ্রাণ বা শস্যদেবতার প্রতীক হিসাবে মানব-প্রতিভূ নির্বাচনের রীতি ছিল।[২৫] অন্যান্য পণ্ডিতরাও যে এ-বিষয়ে সহমত পোষণ করেন, তাও আমরা দেখব। শস্যদেবতার মানব-প্রতিভূ হিসাবে যিনি নির্বাচিত হতেন, তিনি একজন যুবাপুরুষ। একই ভাবে ধরিত্রীদেবীর মানবী-প্রতিভূ হিসাবে থাকতেন একজন পূজারিণী।

প্রাচীন সভ্যতার বিকাশভূমি ঐ সমস্ত অঞ্চলে যে বৃহৎ দেবীমন্দিরগুলি গড়ে উঠেছিল, তার সর্বময় কর্তৃত্ব থাকত ঐ প্রধান পূজারিণীর হাতে। পুরুষ-প্রতিভূর একটা বিশেষ দায়িত্ব ছিল নারী পূজারিণীকে গর্ভবতী করা, শস্যপ্রাণ যেভাবে ধরণীকে ফলবতী করে। শস্যদেবতার প্রতিভূটিকে অবশ্য এরপরও একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হতো। শস্যপ্রাণ যে-ভাবে বৎসরান্তে একবার মৃত্যুবরণ করে, তারই অনুকরণে পুরুষ-প্রতিভূটিকেও মৃত্যুবরণ করতে হতো। সেই মৃত্যু সংঘটিত হতো কোথাও বা সরাসরি বলিদানের মাধ্যমে, কোথাও দুর্ঘটনা আক্রমণ বা অন্য কোনো উপায়ে। মৃত্যুর পর মৃতের রক্ত মন্দির-সংলগ্ন জমিতে সিঞ্চন করার রীতিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল। শস্যপ্রাণের সরাসরি সংস্রবে ধরণী আরো উর্বরা হবে, এমন বিশ্বাস তার পিছনে কাজ করত।

ফ্রেজার বলেছেন যে অন্তত তিনজন শস্যদেবতা, আত্তিস, এ্যাডোনিস ও ডায়োনিসাস, এই ধরনের মনুষ্যবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অর্থাৎ এঁদের নিয়ে যে পূজা-অনুষ্ঠান হতো, মনুষ্যবলি তার অঙ্গ ছিল।[২৩] ধরিত্রী দেবীর পূজারিণীকেও সেই সঙ্গে একটা দায়িত্ব পালন করতে হতো। ধরিত্রীকে পরবর্তী বছরেও ফসলের জন্ম দিতে হবে, অতএব দেবীর প্রধানা পূজারিণীকেও পরবর্তী বছরে আবার গর্ভবতী হওয়ার দায় বহন করতে হতো। পরবর্তী বছরের জন্যও নির্বাচিত হতেন আরেকজন নূতন প্রতিভূ, কিন্তু নির্বাচনলগ্নেই তার আয়ুষ্কাল সীমায়িত হয়ে যেত আর একটিমাত্র বছরে। বছরের পর বছর ধরে এই বলিদানের অনুবর্তন ঘটত। প্রতিবারই বেছে নেওয়া হতো নতুন স্বামী অথবা প্রেমিক, পূজারিণীর সঙ্গে এক-বৎসর সহবাসান্তে যাকে মৃত্যুবরণ করতে হতো। নির্বাচনের সময় থেকে মৃত্যুর আগে অবধি অবশ্য শস্যদেবতার প্রতিভূটির নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকত—প্রধানা পূজারিণীর স্বামী হিসাবে তার মর্যাদা হতো প্রধান পুরোহিতের, প্রধানার সহচরী অন্য পূজারিণীদের উপরও থাকত তার অবাধ অধিকার ইত্যাদি। মন্দিরকেন্দ্রিক ঐ সমস্ত সমাজের প্রধানা পূজারিণী ও তার সাময়িক স্বামীই পরবর্তী পর্যায়ে রানী ও রাজায় পরিণত হয়েছিলেন, কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

দেখা যাচ্ছে প্রকৃতি জগতে শস্যপ্রাণের মৃত্যু ও তার পুনরুজ্জীবনের বিকল্প রচনার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি ঐ সমস্ত সমাজে ব্যাপকভাবেই অনুসৃত হতো। রবার্ট গ্রেভস গ্রীক পুরাণ কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি: ১. **The tribal nymph, it seems, chose an annual lover from his entourage of youngmen, a king**

to be sacrificed when year ended making him a symbol of fertility rather than the object of her erotic lustre. ২. The annual bath with which Hera renewed her virginity was also taken by Aphrodite at Paphos, it seems to have been the murder of her lover, the sacred king. ৩. Dionysus began, probably as a type of sacred king whom the goddess ritually murdered with a thundered belt in the seventh month from the winter solstice and whom priestesses devoured. ৪. The myth of Lycurgus and Diomedes suggests that the pre-hallenic sacred king was torn in pieces at the close of his reign by women disguised as mares.[২৭]

গ্রেভস আরো বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন. তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। এই কাহিনীগুলোর তাৎপর্য প্রসঙ্গে কোসাম্বী বলেছেন যে প্রধানা পূজারিণী সাময়িক স্বামীদের বলিদানের মাধ্যমে এভাবেই নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিশুদ্ধ করে নিতেন।[২৮] পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর গ্রীসের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। গ্রেভস বলেছেন যে প্রাক-হেলেনিক-পর্বের কাহিনীতে দেখা যায় যে দেবী তাড়া করছেন প্রেমিক বা রাজাকে এবং শেষ পর্যন্ত ঋতুচক্রের আবর্তনের অন্তে দেবীর হাতে রাজা নিহত হচ্ছেন। অপরদিকে উত্তর-হেলেনিক কাহিনীগুলোতে দেখা দেখা যাবে যে দেবীই ত্রস্ত হয়ে পালাচ্ছেন এবং দেবতা তাঁকে তাড়া করছেন এবং শেষ পর্যন্ত ধর্ষণ করছেন।[২৯]

মেরলিন স্টোন এ-ধরনের ঘটনার অপেক্ষাকৃত আধুনিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে নাইজেরিয়ার কোনো কোনো উপজাতীয় সমাজে রানী যে-পুরুষটির সঙ্গে সহবাস করেন, গর্ভবতী হওয়ার পর নারীর সহচরীরা সে-পুরুষটিকে হত্যা করে। কারণ তার দায়িত্ব সম্পাদিত হয়ে গেছে। এই দৃষ্টান্তটি টেনে স্টোন বলছেন অজস্র কিংবদন্তী, কাহিনী, লোকগাথায় যে-সমস্ত উল্লেখ রয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে দেবী-পূজক প্রায় সমস্ত সমাজেই এ-ধরনের স্বামী হত্যার রীতি ছিল। আরো কিছু কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে যাতে মনে হয় নব্যপ্রস্তর যুগে প্রধানা পূজারিণীর সঙ্গী পুরুষটির বলিদানের পর পূজারিণীকে আনুষ্ঠানিক শোক পালন করতে হতো।[৩০]

সব মিলিয়ে ব্যাপার দাঁড়াল এই যে সমস্ত শস্যদেবতার সঙ্গে মৃত্যু এবং পুনর্জীবন লাভের ধারণাটি সংশ্লিষ্ট, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কোনো-না-কোনো ধরিত্রীরূপিণী দেবীর স্বামী অথবা প্রেমিক। এই দেবতা ও দেবীর পুরুষ-প্রতিভূ

এবং মানবী-প্রতিভূকে নিয়ে সুপ্রাচীন কিছু ধর্মাচার গড়ে উঠেছিল। পুরুষ-প্রতিভূকে হত্যা করে পরবর্তী বছরের জন্য নতুন প্রতিভূ গ্রহণ করাটা ছিল সেই ধর্মাচারের অবশ্যপালনীয় অঙ্গ। এটাকেই ধরে নেওয়া হতো মৃত দেবতার পুনরুজ্জীবন হিসাবে। অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত দেবতার ধারণার সঙ্গে স্নেহকোমল শস্য-দেবীর শোকাতুরা বিরহিণী যে রূপটি আমাদের আজকের চেতনায় বিধৃত, আদিম লোকবিশ্বাসে তাঁরা ছিলেন পার্থীংস্ত্রী। মানবী-প্রতিভূ হিসাবে গণ্য করা হতো দেবীর প্রধান পূজারিণীকে এবং বাস্তবক্ষেত্রেও এই পূজারিণীরা পার্থীংস্ত্রীর ভূমিকা পালন করতেন। অবশ্য গোটা ব্যাপারটাই ঘটত ধর্মাচারের প্রয়োজনে, যে-ধর্মাচারের লক্ষ্য ছিল শস্য উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমে গোষ্ঠীস্বার্থের সংরক্ষণ। আদিম কৃষিজীবী সমাজের যুক্তিধারাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই এই আপাত-নৃশংস অনুষ্ঠানের তাৎপর্য নির্ণয় সম্ভব। আজকের পরিশীলিত মানবিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে এর বিচার করা নিরর্থক।

পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগেই কোথাও কোথাও বলিদান প্রথাটি উঠে গিয়েছিল, কিন্তু ঐ ধর্মাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ আরো দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। প্রাচীন সুমেরের অধুনাপ্রাপ্ত একটি প্রস্তরলিপির পাঠোদ্ধার করে স্যামুয়েল নোয়া ক্র্যামার এই ধরনের একটি অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। একটু দীর্ঘ হলেও ক্র্যামারের বিবরণের প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা কঠিন :

"Only a month or so ago, in an article entitled *Cuneiform Studies and History of literature*, it was my privilege to publish copies and translation of five new 'Sacred Marraige' compositions. One of them is a myth. The text begins with a monologue by Inanna (দেবী ইনান্না) in which she recounts her appointment of Dammuz (দেবতা তম্মুজ) to the godship of Sumer, her bridal preparation for the ensuing marraige, which accompanied their union. The poet then informs us that Inanna, in honour of the marraige, has composed a song to the vulba in which she compared it to follow land, a field, a hillock and ends it by asking who will 'plow' it for her. Dammuzi responds that he will 'plow' it for her. Following a passage pertaining to the

sexual union of the couple, there is a detailed description of the resultant vegetation. After which, Inanna, now joyfully dwelling by Dammuzi's side in the palace, designated as the 'house of life', utter a plea to the king to supply her with rich flesh, milk, cheese and cream and makes him the reassuring promise, re-iterated again and again that she will watch over and preserve the palace and its well-being.

It is certain from the text that atleast from the time of the third dynesty of 'Ur' on, the king took the place of Dammuzi as the husband of Inanna (a priestess acted the role) and their sexual union ensured the fertility of the land and the prosperity of the people."৩১

বোঝা যায় যে এই প্রত্নলিপিটি রচিত হয়েছে পুরুষ-প্রাধান্য ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, অর্থাৎ লিপিটি পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত। তবুও দাম্মুজি-ইনান্না উপাখ্যান এবং তৎ সম্পর্কিত ধর্মাচারের আদিম রূপটি কী ছিল, তার একটা আভাস পরিবর্তিত এই বিবরণ থেকেও লাভ করা সম্ভব। লক্ষণীয় যে তখনও লোকবিশ্বাস অনুসারে ইনান্নাই দাম্মুজিকে রাজা তথা দেবতার পদে নিয়োগ করেন, তাও দেবীর সঙ্গে সহবাসে সম্মতি-প্রদানের শর্তে। দৈহিক মিলন সাধিত হওয়ার পর ইনান্নার প্রধান দায়িত্ব দাঁড়িয়ে যায় দাম্মুজিকে বারবার অভয় প্রদানের। সর্বোপরি দেবীর প্রধান পূজারিণীর স্বামী হিসাবেই রাজা তাঁর কর্তৃত্বকে লোকচক্ষে বৈধ করে নিচ্ছেন।

আমাদের মূল আলোচনায় এবার ফিরে আসা যাক। সাবিত্রী-উপাখ্যানকে সাবিত্রী ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানের আলোকে পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে ওসিরিস, তম্মুজ, আত্তিস-এর মতো সত্যবানও শস্যদেবতা এবং আইসিস, ইসথার, সিবিলির মতো সাবিত্রীও ধরিত্রীদেবীর এদেশীয় সংস্করণ। নিহত ও পুনরুজ্জীবিত শস্যদেবতাকে নিয়ে যে সমস্ত ধর্মাচার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হতো, তা যে একটা বিশেষ প্যাটার্নে পরিণত হয়েছিল, সেটা আজ তথ্য বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন হচ্ছে, সাবিত্রীব্রতও যদি শস্যদেবতার পুনরুজ্জীবনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তবে অন্যত্র অনুসৃত যে-প্যাটার্নটার কথা আমরা বলেছি, তার সঙ্গে ঐ ব্রতের সঙ্গতি কতখানি ছিল? অর্থাৎ ধরিত্রীদেবীর মানবী-প্রতিভূ

পূজারিণীরা অন্যত্র যে রকম সাময়িক স্বামী-গ্রহণ এবং বৎসরান্তে তাকে নিধন করতেন, সাবিত্রী দেবীর আদিম পূজারিণীদের ধর্মাচারও কি সমজাতীয় ছিল? সতীত্ব ও স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা হিসাবে যে-নারী দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর রূপটি কি ছিল পতিঘাতিনীর? সাম্বৎসরিক স্বামীবদলই কি সত্যবানের পুনর্জীবন লাভের রূপকথাটির জন্ম দিয়েছে? এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশই ঘটত না, যদি না আমরা জানতাম যে আইসিস, ইসথার বা সিবিলি কিংবা সমজাতীয় অন্য ধরিত্রীপ্রতিম দেবীরাও পরবর্তী রূপকল্পনায় স্বামীপ্রেমের আদর্শ হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। অথচ অনুসন্ধানের ফলে তাদের অন্তস্তর রূপ উন্মোচিত হয়েছে। আজ এ-তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মাচারগুলো ছিল পরবর্তী রূপ-কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত।

সাবিত্রীর উপাখ্যানটিকে এই প্রশ্নের আলোকে আমরা পরে বিচার করব। তার আগে আমরা এদেশীয় অপর একটি প্রেমকাহিনীর উল্লেখ করব, যে-কাহিনী সুপরিজ্ঞাত এবং যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পর্যায়ে কবি কালিদাস একটি পরিশীলিত নাটক রচনা করেছেন। "বিক্রমোর্বশীয়ম্" নাটকে বিরহের সুরটিই প্রধান, মিলন-সংঘটনটা আরোপিত মাত্র। উর্বশী-পুরূরবার কাহিনীর প্রাচীনতম উল্লেখ আমরা পাই ঋগ্বেদে। শতপথ ব্রাহ্মণ, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদিসহ বিভিন্ন গ্রন্থে কাহিনীটির অন্তত দশটি পাঠভেদ আছে। ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বী এই বিভিন্ন পাঠভেদের পর্যায়গুলিকে বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করেছেন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে চিরন্তন বিরহ-মিলনের এই প্রেমগাথাটি আদিতে রচিত হয়েছিল উর্বশীর হাতে পুরূরবার নিহত হওয়ার প্রাক্‌কালীন সংলাপ হিসাবে।[৩২] ঋগ্বেদের শ্লোকগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে কী-ভাবে প্রাণরক্ষার জন্য পুরূরবা আকুল প্রার্থনা করছেন, এবং উর্বশী তা প্রত্যাখ্যান করছেন। কোসাম্বীর মতে উর্বশী মূলত দেবীর মানবী-প্রতিভূ বা পূজারিণী, পুরূরবা সাময়িক প্রেমিক, যার আয়ুকাল একটি বিশেষ কালসীমার মধ্যে আবদ্ধ, তারপর প্রেমিকা-পূজারিণীর হাতে মৃত্যুই যার বিধিলিপি। তাঁর মতে ঋগ্বেদের শ্লোকগুলি একটি ধর্মাচার-ভিত্তিক নাটকের (ritual drama) অংশমাত্র। ঋগ্বেদের যুগে তা অভিনীত হতো এবং তারও আগের পর্যায়ে বাস্তবেও হত্যা-কাণ্ডটি সংঘটিত হতো।[৩৩]

আরেকটি ছোট্ট তথ্যের উল্লেখ করি। কোসাম্বীই এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৩৪] কালীর পদতলে লুণ্ঠিত শিবের মূর্তিটি আমাদের সবারই

পরিচিত। কিন্তু কালীঘাটের পটে এই ধ্যানটির একটি বিশিষ্ট প্রকারভেদ চিত্রিত হয়ে থাকে। শিব সেখানে মৃত (শবরূপী শিবের কথা অনেক ধ্যানমন্ত্রেই রয়েছে), কালীর পদতলে শায়িত এবং সেই শবরূপী শিবের দেহ থেকে একজন নবীনপুরুষ নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন। কোসাম্বী অবশ্য এই চিত্রের অন্যতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর মতে ধারাবাহিক ধর্মীয় সংঘাতের এটা একটা চিত্রায়িত রূপ। আমাদের ধারণা অন্যরূপ। দৈহিক বিচারে অসমর্থ স্বামীর মৃত্যু-সংঘটন এবং তার পরিবর্তে নবীন সমর্থ স্বামীগ্রহণ আদিম দেবী-পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা সুপরিচিত motif। বস্তুত ফ্রেজারের *Golden Bough* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থটি রচিতই হয়েছে এই motif-এর বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে। এটাও সুপরিজ্ঞাত যে কালীঘাটের পটের মধ্যে এ দেশের সুপ্রাচীন লোকায়ত পরম্পরার একটি ধারা সতত বহমান। দেবী-পরিকল্পনার সঙ্গে স্বামী-পরিবর্তনের একটা সংস্রব এদেশের প্রাচীন লোকবিশ্বাসে দৃঢ়মূল ছিল, কালীঘাটের এই ধরনের পট তারই স্মারক বলে আমাদের মনে হয়। এ-ধারণা যে কষ্টকল্পিত নয়, তার আরো প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাই নবদ্বীপের শক্তিরাস উৎসবে এখনও যে কালীমূর্তি পূজিতা হন, তার রূপকল্পনার মধ্যে। শিবের শবদেহের উপর অধিষ্ঠিতা কালী এখানে শবদেহ-নির্গত একজন যুবাপুরুষের সঙ্গে সরাসরি সঙ্গমে নিরতা।[১৭] অর্থাৎ সহবাসের প্রয়োজনে নিহত স্বামীর বিকল্প হিসাবে নতুন স্বামীগ্রহণের ব্যাপারটা এদেশীয় দেবী-মাহাত্ম্যেও নিতান্ত আগন্তুক ধারণা নয়, বরঞ্চ ঐতিহ্যবাহী ধর্মাচারে তার বিপরীত প্রমাণই বর্তমান।

৫

ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বী সামাজিক ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহের ব্যাপারে পুরাণকাহিনীগুলোর গুরুত্বের কথা বারবার বলেন। তারই সূত্র ধরে রমিলা থাপার বলেছেন, "This does not require a search for new evidence so much as a re-reading of the sources, with a different sets of questions in mind".[১৮] আমরাও সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানটিকে আবার পরীক্ষা করতে চাইছি, অবশ্য সদ্য-উত্থাপিত নতুন প্রশ্নগুলির আলোকে। অসুবিধা হচ্ছে, মহাভারতে বা অন্যত্র সাবিত্রী-উপাখ্যানের একটি পরিশীলিত রূপই আমরা পাচ্ছি, প্রাচীনতর বা অন্যতর কোনো পাঠভেদ আমাদের হাতে নেই। উর্বশী-পুরূরবার কাহিনীর ব্যাপারে কোসাম্বী এটুকু বাড়তি সুবিধা পেয়েছিলেন। তবুও খুঁজে-পেতে মহাভারতের মাজিত প্রতিরূপের মধ্যেই কতকগুলো প্রাচীনতর উপাদান

চিহ্নিত করা সম্ভব। উপাদানগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাহিনীর বিভিন্ন অংশে, বিচ্ছিন্নভাবে, পরিপ্রেক্ষিতভ্রষ্ট অবস্থায়। পরিপ্রেক্ষিত যদি স্পষ্টতর করে তোলা যায়, তবে আপাততরুত্বহীন এই তথ্যগুলিই অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

সাবিত্রী-সত্যবানের পিতৃপরিচয় দিয়েই শুরু করি। সাবিত্রীর পিতা মদ্রদেশের রাজা, নাম অশ্বপতি। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেন শাল্বরাজ। সিলভ্যাঁ লেভি জানাচ্ছেন যে প্রাচীন বৈয়াকরণরা বরাবরই মদ্র (মদ্রক) জাতিকে শাল্বজনগোষ্ঠীর একটি শাখা হিসাবেই বর্ণনা করেছেন।[৩৭] প্রাচীন কাহিনীতে আবার যখনই তাদের আলাদাভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, তখনও দেখা গেছে যে তারা ছিলেন দুটো সন্নিহিত অঞ্চলের বাসিন্দা।[৩৮] সুধাকর চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে শাল্বদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল পূর্বপাঞ্জাব থেকে আরাবল্লী পর্যন্ত, আর মদ্ররা আদিতে বাস করত পশ্চিম পাঞ্জাবের শিয়ালকোট বা প্রাচীন শাকল অঞ্চলে। শাল্বদের একটি গোষ্ঠীর নাম ছিল ভূলিঙ্গ, যা থেকে সিলভ্যাঁ লেভি অনুমান করেছেন যে ওরা মূলত ছিল অস্ট্রিকভাষী প্রোটো-অস্ট্রলয়েড জনগোষ্ঠীর মানুষ। সিলভ্যাঁ লেভিই অন্যত্র দেখিয়েছেন যে লিঙ্গ শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় এসেছে অস্ট্রিক ভাষা থেকে, অস্ট্রিকভাষীদের কৃষিকাজে ব্যবহৃত ভূমিখনন যন্ত্রের (hoe) নামের সঙ্গে শব্দটি সংশ্লিষ্ট।[৩৯]

দেখা যাচ্ছে শাল্ব এবং মদ্ররা একই জনগোষ্ঠীর বা সমজাতীয় সন্নিহিত জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। শাল্বদের সম্ভাব্য অনার্য-পরিচিতির কথা আলোচনা করেছি। মদ্রদের সম্পর্কে উচ্চকোটির আর্য-প্রভাবিত সমাজের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় মহাভারতের বর্ণনায়, যেখানে কর্ণ মদ্ররাজ শল্যকে ভর্ৎসনা করছেন। আরট্ট, বাহিক ও মদ্ররা (এ শব্দগুলো কখনো দেশনাম, কখনো বা জাতিনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে) ছিল একই ধরনের সামাজিক সংস্কৃতির অংশীদার। সে-কথা উল্লেখ করে কর্ণ বলছেন, "তথায় কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দন রহিত হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীরের সমীপে নৃত্য ও গর্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চিৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা পরপুরুষ বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করত উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক বাক্য প্রয়োগ করে।... দেবগণ এই ব্রতবিহীন দুরাচারদের অন্ন ভক্ষণ করেন না।"[৪০] এই সমস্ত কুলকামিনীরা সকলেই ব্যভিচারিণী, এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে কর্ণ বলেছেন, "হে শল্য, এই কারণেই আরট্টদিগের পুত্ররা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হয়।"[৪১]

এই বিবরণের মধ্যে অতিশয়োক্তি যেটুকু রয়েছে তা বিদ্বেষপ্রসূত, কিন্তু

মূলত এর মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পুরুষপ্রধান সমাজে সতীত্বের যে-ধারণা, মাতৃপ্রধান সমাজে তার অস্তিত্ব ছিল না—মহাভারতের সঙ্কলয়িতাদের দৃষ্টিতে এদের তাই এত ধিক্কারযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। বিবরণটির মধ্যে আমরা মদনোৎসব (Saturnalia) জাতীয় অনুষ্ঠানের ইঙ্গিতও পাচ্ছি। প্রজননের জন্য মদনোৎসব এই ধরনের সমাজের স্বাভাবিক জীবনধারারই অংশ ছিল। এ ধরনের উৎসবের সঙ্গে প্রাচীন ল্যাটিনয়ামের অধিকাংশ রাজার জন্মই সংশ্লিষ্ট ছিল বলে ফ্রেজার অনুমান করেছেন। ঐ সমস্ত রাজাদের অধিকাংশরই পিতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। ফ্রেজার বলছেন যে আসলে ঐ সময়ে প্রাচীন ল্যাটিন সমাজে পিতৃ-পরিচয় ব্যাপারটার কোনো গুরুত্বই ছিল না। একটা বিশেষ সময়ে রাজ-পরিবার ও অন্য অভিজাত পরিবারের মানুষদের অবাধ কামক্রীড়ার সুযোগ দেওয়ার রীতি ছিল এবং সেই সূত্রেই এই সমস্ত রাজাদের জন্ম হয়েছিল।[৪২]

মদ্র এবং সমজাতীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে মহাভারতের এই বিবরণ যে মাতৃ-প্রাধান্যের ইঙ্গিতবাহী সে-সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৪৩] ভাগিনেয়দের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের তথ্যটি কৌতূহলপ্রদ। মাতৃপ্রধান সমাজ যখন পিতৃপ্রাধান্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, বিবর্তনের এই মধ্যবর্তী পর্যায়টাতেই ভাগিনেয়রা এই সুযোগটি পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের খাসি-সিন্টেংদের মধ্যে এখনও কন্যাই সম্পত্তির অধিকারী, পুত্র নয়। কিন্তু সিন্টেংরা যে জয়ন্তীয়া রাজ্য গড়ে তুলেছিল, সেখানে রাজপদে অভিষিক্ত হতেন রাজার ভাগিনেয়, রাজপুত্র নয়। ১৮৩৬ সালে জয়ন্তীয়া রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে যায়, সে-সময় পর্যন্তই উত্তরাধিকারের এই রীতি অব্যাহত ছিল।

যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে হোমাগ্নি, তপোবন, মুনিঋষি, ব্রত-উপাসনা ইত্যাদির বিস্তর অবতারণা ঘটিয়ে মহাভারতের সাবিত্রী-উপাখ্যানে যে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য আবহটি তৈরি করা হয়েছে, সাবিত্রী-সত্যবানের পিতৃপরিচয় বা জাতি পরিচয় কিন্তু সে-আবহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আদি পরিচয়ে সাবিত্রী ও সত্যবান উভয়েই এমন একটি সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, মহাভারতের আলোচ্য অংশটি রচিত হওয়ার যুগেও যে-সমাজের সঙ্গে মাতৃপ্রাধান্যকে সম্পৃক্ত করা হতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীর সঙ্গে সহবাসের পরেই পাণ্ডুর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার বহুজ্ঞাত ঘটনাটিও কিন্তু নতুন ব্যঞ্জনা বহন করে আনে। উল্লেখ্য যে

মহাভারতের আলোচ্য-অংশেই মদ্ররমণীদের বারবার রাক্ষসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৪] যাই হোক, এ-সব বাদ দিয়েও ইতিহাসের বিচারে আমরা পাচ্ছি যে মদ্র ও শাবরা আর্যেতর কৃষিজীবী ও মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন।

দ্বিতীয় কৌতূহলপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, অশ্বপতি যজ্ঞ করেছিলেন পুত্র কামনায় কিন্তু তিনি লাভ করলেন কন্যাসন্তান। কাহিনীতে রয়েছে যে হোম করা হয়েছিল সাবিত্রী মন্ত্রে এবং সেইজন্যে সাবিত্রী দেবীর বরেই অশ্বপতি-কন্যা মানবী সাবিত্রীর জন্ম হয়েছিল। পুত্রের বদলে কন্যার জন্ম কেন হয়েছিল, তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টাও কাহিনীতে রয়েছে। বলা হয়েছে যে, অশ্বপতির যজ্ঞে সন্তুষ্ট সাবিত্রী দেবী নিজে আবির্ভূতা হয়ে রাজাকে জানালেন, "আমি পূর্বেই আপনার এই অভিপ্রায় জানিয়া আপনার পুত্রের জন্য ভগবান ব্রহ্মার নিকট বলিয়াছিলাম। তখন ব্রহ্মা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন এবং সেই অনুগ্রহে সত্বরই আপনার একটি তেজস্বিনী কন্যা জন্মিবে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মার আদেশে আপনাকে বলিতেছি যে আপনি ইহার পর আর কোনোক্রমেই কিছু বলিবেন না।"[৪৫]

পুত্রের পরিবর্তে কন্যারত্ন লাভ করে রাজা অশ্বপতি কতখানি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন জানি না, আমরা কিন্তু ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত এবং সাবিত্রী দেবীর কৈফিয়ৎকে যথেষ্ট সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করতে পারছি না। বরং এমন অনুমানই সঙ্গত যে, যে-ধরনের সমাজে এবং যে-যুগে সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীটির আদিরূপটি গড়ে উঠেছিল, সেখানে কন্যাসন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরাধিকারের সমস্যাটি মিটে যেত, মদ্রদের সামাজিক সংগঠন এবং আচার-বিধির যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে এমনটি ঘটাই তো স্বাভাবিক। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, "the Madrakas, Arattas and Bahikas, mentioned in the Mahabharata, were matrilineal people."[৪৬] পরবর্তী ধ্যানধারণায় মাতৃধারায় বাহিত উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা আপত্তিকর ঠেকেছিল, তাই গোঁজামিল হিসাবে সাবিত্রী দেবীর মুখে একটা কৈফিয়ৎ জুড়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু কন্যাজন্মের মূল ঘটনাকে ছাঁটাই করা আর সম্ভব হয়নি।

প্রায় সমতুল অন্য একটা বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বৈবস্বত মনু পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন, কিন্তু যজ্ঞে নাকি ত্রুটি থেকে গিয়েছিল, তাই জন্ম হলো কন্যার, কন্যার নাম ইলা। বিভ্রাট হয়ে যাওয়ায় সংশোধনের চেষ্টা হলো এবং বহু সাধ্য-সাধনার পর ব্রহ্মা বর দিলেন যে ইলা কিছুদিনের জন্য পুরুষে রূপান্তরিত হবেন এবং তখন তার নাম হবে ইল। এই ইলই চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ। ঐতিহাসিক রমিলা থাপারের

মতে মাতার মাধ্যমে যে-রাজবংশের সূচনা হয়েছিল, পরবর্তীকালে পুরুষ-প্রাধান্যের ধারণার সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই এই গল্প তৈরি হয়েছিল।[৪৭]

মাতৃপ্রাধান্যের আরো স্মারক কাহিনীর মধ্যে রয়েছে। যমরাজা সাবিত্রীকে দুটো বর দিয়েছিলেন; বরদানের ভাবটা বঙ্গানুবাদে এ-রকম দাঁড়ায়: "সত্যবান তোমার গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করিবেন এবং তাহারা সকলেও রাজা, পুত্র-পৌত্রশালী এবং জগতে চিরকালের জন্য তোমার নামে (সাবিত্রাঃ) বিখ্যাত হইবে। আর তোমার মাতা মালবরাজতনয়ার (মালবী) গর্ভে তোমার পিতারও একশত পুত্র হইবে এবং তোমার সেই ভ্রাতারাও চিরকালের জন্য পুত্রপৌত্রশালী ও দেবতুল্য হইয়া মালব নামে খ্যাত হইবে।"[৪৮] অর্থাৎ সাবিত্রীর পুত্ররা পিতা সত্যবানের নামে পরিচিত হচ্ছেন না, মালবীর পুত্ররাও অশ্বপতির নামে পরিচিত হচ্ছেন না, উভয়েই খ্যাত হচ্ছেন মাতৃ নামে। অর্থাৎ সাবিত্রী ও মালবীর পুত্ররা পিতৃগোত্র ধারণ করছেন না, তাঁরা মাতৃগোত্রের অধিকারী। দেখা যাচ্ছে পর্যাপ্ত পরিশীলনের পরও মাতৃপ্রাধান্যের এই স্মারকটিকে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি।

রাজকন্যা সাবিত্রীর সঙ্গে দেবী সাবিত্রীর সাযুজ্য প্রদর্শনের চেষ্টাও মহাভারতের দুটি শ্লোকে লক্ষণীয়। শ্লোকগুলির অনুবাদ: ১. "সাবিত্রী দেবী প্রসন্ন হইয়া সেই কন্যাকে দান করিয়াছিলেন বলিয়া পিতা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নাম দিয়াছিলেন সাবিত্রী।" ২. "গৌতম বলিলেন, সাবিত্রী, তোমাকে আমি তেজে সাবিত্রীতুল্য বলিয়াই জানি।"[৪৯] এই সাযুজ্য সৃষ্টির চেষ্টা কেন? আমরা আগেই দেখিয়েছি যে আদিম কৃষিজীবী সমাজে মানবী-পূজারিণীদেরই মূল দেবীর প্রতিভূ হিসাবে ধরে নেওয়া হতো। দেবীর সঙ্গে পূজারিণীর এই সাযুজ্যসৃষ্টির ফলেই জন্ম নিয়েছিল বাৎসরিক স্বামীগ্রহণ, গর্ভসঞ্চারান্তে স্বামীর মৃত্যু-সংঘটন, পুনর্বার স্বামী-গ্রহণ ইত্যাদি ধর্মাচারের। মনে হয়, দেবী সাবিত্রীর সঙ্গে তাঁর মানবী-প্রতিভূকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রবণতা আদি কাহিনীতে ছিল, মহাভারতে তার অবশেষটুকু টিঁকে আছে। সমজাতীয় অন্যান্য দেবীরাও যে তাঁদের মানবী-প্রতিভূর মাধ্যমেই পূজিত হতেন, তার আলোচনা আমরা আগে করেছি। আমাদের দেশে এখনও যে কালীর ভর হওয়া, মনসার ভর হওয়া জাতীয় ব্যাপার অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতে টিঁকে আছে, সেগুলোও এই মানবী-প্রতিভূ সৃষ্টির আদিম প্রয়াসেরই স্মারক।

আরেকটি তথ্য আমরা কাহিনীতে পাই, যা আপাতদৃষ্টিতে একটু বিস্ময়কর। রূপেগুণে বিভূষিতা সাবিত্রী যৌবনে পদার্পণ করলেন, কিন্তু তাঁর পাণিপ্রার্থী

কাউকে পাওয়া গেল না। "কিন্তু তাঁহার তেজে অভিভূত হইয়া কোনো যুবাই সেই পদ্মপলাশাক্ষী ও তেজস্বিনী কন্যাকে প্রার্থনা করিল না।"[৫০] মহাভারতের মূল ঘটনার যুগে এমনটি হওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ সুন্দরী রাজকন্যার জন্য স্বয়ম্বরসভায় অজস্র রাজা-রাজপুত্রের সমাবেশ ঘটাই ছিল তখনকার রীতি। অনুমান সাহিত্যিক-বিচারেও ঐ শ্লোকটি বিভ্রান্তিকর, কারণ সাবিত্রীর চরিত্রে পরবর্তী পর্যায়ে বিকর্ষণসৃষ্টিকারী কোনো অস্বাভাবিক তেজস্বিতার পরিচয় আমরা পাই না। বরঞ্চ শ্বশুরালয়ে নম্র, সেবাপরায়ণা এবং সকলের একান্ত অনুগতা বধূরূপেই তাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। আসলে সাবিত্রী চরিত্রের প্রাচীনতর উপাদানের ইঙ্গিত ওই তেজস্বিতার অন্তরালে রয়ে গেছে। কী সেই তেজস্বিতার স্বরূপ যা যুবাপুরুষদের দূরে সরিয়ে রাখত? এ-প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আবার আমাদের বাইরের দৃষ্টান্তের সাহায্য নিতে হবে।

রবার্ট গ্রীভস-এর একটি মন্তব্য আরো আগে উল্লেখ করেছি যেখানে তিনি বলেছেন যে হেলেনীয় যুগের আগেকার গ্রীক পুরাণ-কাহিনীতে সাধারণভাবেই দেখা যায় যে নায়িকারা ভীতসন্ত্রস্ত নায়কদের তাড়া করে বেড়াচ্ছেন। সমজাতীয় অন্য উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি আরেকটু স্পষ্ট করা যাক: সুমেরের ইসথার দেবীর পরিচয় আমরা জানি, শস্যদেবতা তাম্মুজের পুনরুজ্জীবনের কাহিনীর সঙ্গে তিনি যুক্ত; এই দেবী একবার সুমেরের অর্ধ-ঐতিহাসিক অর্ধ-পৌরাণিক বীর গিলগামেশের প্রণয়প্রার্থী হয়েছিলেন। যে-ভাষায় তিনি প্রণয়ীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, সুমেরের সুপ্রাচীন প্রস্তরলিপির ইংরেজি অনুবাদ থেকে তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> The yield of hills and plains they shall
> Bring before thee as tribute
> Thy chariot horses shall be tamed for racing,
> Thine ox under yoke shall not have a rival."[৫১]

এতসব প্রাপ্তির আশ্বাস সত্ত্বেও গিলগামেশ কিন্তু ইসথারকে প্রত্যাখ্যান করেন। একের পর এক দৃষ্টান্ত দিয়ে ইসথারকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর পূর্ববর্তী প্রেমিকদের দুর্গতির কথা:

> "Which lover didst you love forever
> Which of thy shepherd pleased thee for all time
> For Tammuz, lover of thy youth

Thou hast waiting year after year
Having loved dapled shephered bird
Thou smotest him, breaking his wings,
In the grove he sits crying kappi (my wings)
Then thou didst love a lion, perfect in strength
Seven pits thou didst dig for him
Then a stallion thou lovedst, famed in battle
The whip, the spur, the lash thou ordained for him."[৭২]

অভিযোগের তালিকাটি আরো দীর্ঘ, আমাদের কাজ অবশ্য এটুকুতেই চলবে। এই সংলাপের তাৎপর্য নির্ণয় দুরূহ নয়, তবুও আমরা বিশারদ পণ্ডিত জন গ্রে-র উক্তি দিচ্ছি : "Gilgamesh spurn the advances of the goddess, citing various examples from nature and mythology, where the love of the goddess had incited, eventually to degrade and destroy".[৭৩] গ্রে আরো জানাচ্ছেন যে দেবীর প্রণয় প্রত্যাখ্যানের মোটিফটি গ্রীক পুরাণে বারবারই ফিরে ফিরে এসেছে, যেমন আর্টেমিস ও এ্যাকটিন-এর কাহিনী। একই মোটিফ পাওয়া যাচ্ছে রাসসামরা প্রত্নলিপিতে যুক্ত কানাইট পুরাকাহিনীতে যেখানে রাজপুত্র আকথ (Aqth) প্রত্যাখ্যান করছেন দেবী আনাথকে।[৭৪]

মেরলিন স্টোন অনুমান করছেন যে, যে-প্রত্নলিপিতে ইসথার-গিলগামেশ সংলাপটি পাওয়া গেছে, তার রচনাকাল সম্ভবত সুমেরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ।[৭৫] অর্থাৎ পুরুষপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রথমপর্বেও বীরপুরুষরা দেবীর মানবী-প্রতিভূদের ভীতির দৃষ্টিতে দেখতেন, তাঁদের সৌন্দর্য ও সম্পদ সত্ত্বেও। এই মোটিফটি এত সুগভীরভাবে জনমনে প্রোথিত ছিল যে এমনকি শেক্সপিয়ারেও তার ছায়াপাত ঘটেছে। গ্রীক শস্যদেবতা এ্যাডোনিসের প্রণয়িনী আফ্রোদিতিই পরবর্তী পর্যায়ে রূপান্তরিত হন ভেনাস-এ। শেক্সপিয়ারের Venus and Adonis কবিতায় পরবর্তী পরিশীলিত কাহিনীই ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এত পরবর্তী রচনায়ও প্রাচীন উপাদান এখানে-ওখানে মাথা তুলেছে, যেমন প্রণয় নিবেদনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভেনাস খুব সরাসরিই ব্যক্ত করেছেন অ্যাডোনিসকে :

Upon thy earth's increase why shouldst thou feed
Unless the earth with thy increase be fed ?

By law of nature thou art bound to breed
That thine may live when thouself art dead
And so in spilt of death thou dost survive
In that thy likeness still is left alive.

তিনশ' বছর পর সমাজবিজ্ঞানী ফ্রেজার এই কথাগুলিই বলেছেন অন্য ভাষায়, "The corngod produced the corn from himself; he gave his own body to feed the people; he died so that they might live".[২৯]

শেক্সপিয়ারের অ্যাডোনিসও কিন্তু অনিচ্ছুক প্রেমিক, ভেনাসের উদগ্র রতিবাসনা তাকে পীড়িত করে,

I hate not love, but your device in love,
That lends embracements into every stranger,
You do it for increase, O strange excuse
When reason is the bawd to lust's abuse!

অ্যাডোনিসের এই দ্বিধা শুধু নৈতিকতার প্রশ্নে নয়। তাকে স্পর্শ করেছে এক অস্পষ্ট মৃত্যুচেতনা, সম্ভাব্য মিলন তার কাছে মৃত্যুরই অগ্রদূত :

At this Adonis smiles in disdain
That in each cheek appears pretty dimple
Love made those hollows if himself was slain,
He might be buried in a tomb so simple.

এ-ধরনের উপাদান Venus and Adonis-এ আরো অনেক রয়েছে।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে ইসথার, আর্টেমিস, আনাথ, ভেনাস বা আফ্রোদিতি, যাঁরা আদিতে ছিলেন ধরিত্রী দেবী, পরবর্তী রূপান্তরে পরিণত হয়েছেন প্রেমের দেবীতে — বিবর্তনের একটা পর্যায়ে লোকবিশ্বাস অনুসারে তাঁরা চিত্রিত হয়েছেন প্রেমিক আহরণের ব্যাপারে আক্রমণমুখী এবং সম্ভোগের ব্যাপারে লজ্জাহীনা রূপে। বহুচারিতাও তাঁদের চারিত্রলক্ষণ ছিল। অন্যদিকে তাঁদের সম্ভাব্য প্রেমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন অনাগ্রহী এবং কিয়ৎপরিমাণে আতঙ্কিত। দেবীরা প্রায়শই তাই প্রণয় নিবেদনের পরও ব্যর্থকাম। লোকবিশ্বাসের এই যে স্বরূপ, তার নিশ্চয়ই একটা বস্তুগত ভিত্তি ছিল। ধরিত্রী দেবীর মানবী-প্রতিভূ পূজারিণীরা যে-ধরনের ধর্মাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, পুরুষপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে কখন-

বর্জিত সেই সমস্ত আচারের কথা লোকস্মৃতিতে বিদ্যমান ছিল। শুধু স্মৃতি কেন, এ-ধরনের ধর্মাচারের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটতেও সময় লেগেছিল। উপরের তলায় পরিবর্তন ঘটলেও আদিম কৃষিজীবী সমাজের সংরক্ষণশীল মানসিকতা এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানকে বিচ্ছিন্নভাবে আরো দীর্ঘদিন টিকিয়ে রেখেছিল। এই সময়কার সংঘাত ও দ্বন্দ্ব, যা প্রথমে প্রকাশ্য ও পরে অন্তর্লীন ছিল, তারই পটভূমিতে এই সমস্ত প্রত্যাখ্যান-কাহিনীর জন্ম হয়েছিল। কাহিনীগুলি সেই হিসাবে একটি ক্রান্তিকালের স্মারক। গিলগামেশ ও ইসথারের কাহিনীর উল্লেখ করে মের্লিন স্টোন তাই বলেছেন: "The story probably represents one of the earliest refusals of a consort or king to follow the ancient custom and the attempt to institute a more powerful and permanent kingship."[৭]

সাবিত্রীর তেজে যুবাপুরুষরা কেন 'অভিভূত' হতো, এবারে তার কারণ বোঝা যায়। রূপসিনীর তপঃতেজ নয়, রক্তাক্ত অতীতের স্মৃতি এই দেবী ও তাঁর পূজারিণীর উপর যে রুধিরাসিক্ত আরোপ করেছিল, 'জলন্ত তেজ' (জলন্তীমিব তেজসা) শব্দদ্বারা সেই ভীষণারূপকেই শোভন ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। 'পদ্মপলাশলোচনা এই তেজস্বী কন্যাকে কোনো যুবাপুরুষই' কেন প্রার্থনা করল না, তার কারণ বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হয় না।

আরেকটি ছোট তথ্যের উল্লেখ ক'রে, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি ভবিষ্যৎবাণী। সাবিত্রীর স্বামী নির্বাচনের সংবাদে নারদমুনি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে 'সত্যবান অদ্যাবধি সম্বৎসর পূর্ণ হইলে অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে' (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)।

শস্যের জন্মমৃত্যু ঋতুচক্রের বাঁধনে বাঁধা। শস্যদেবতা ও ধরিত্রী দেবীকে নিয়ে গড়ে ওঠা ধর্মাচারগুলোও তাই সাম্বৎসরিক। সমাজবিজ্ঞানীরা তাই শস্যদেবতার মানব-প্রতিভূর অভিধা হিসাবে annual lover কথাটি ব্যবহার করেন, আর বলিদানপর্বকে বলে থাকেন annual sacrifice। দেবীর মানবী-প্রতিভূ কর্তৃক সাময়িক স্বামী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তার অস্থায়ী স্বামীর আয়ুষ্কাল একটিমাত্র বছরে সীমায়িত হয়ে যেত। সত্যবানের মৃত্যুতিথিও তাই পূর্বনির্ধারিত, সাবিত্রীকর্তৃক নির্বাচিত সত্যবানেরা প্রতিবছরই ঐ তিথিতে মৃত্যুবরণ করে নতুন সত্যবানের নির্বাচনপথ সুগম করে দিত। নারদমুনির ভবিষ্যৎবাণীতে ঐ সাম্বৎসরিক বলিদানের বার্তাটিই নিহিত।

সাবিত্রীব্রতে তিনদিন ব্রতপালনান্তে চতুর্থ দিনে স্বামীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করতে হয়। অতঃপর ব্রতধারিণীর আনুষ্ঠানিক অন্নগ্রহণে বংশভোজন বাধ্যতামূলক। দুটো আচারই তাৎপর্যপূর্ণ। স্বামীবরণের অনুষ্ঠানটি পুনর্বিবাহের রূপকমাত্র। তিনদিনের ব্রতপালন স্ব-আরোপিত বৈধব্যপালন, চতুর্থদিনের পুনর্বিবাহে তার অবসান ঘটে। বংশভোজের মধ্যবাসের বিশেষ অধিকার, সধবাত্ব যে পুনরায় অর্জিত হয়েছে, আনুষ্ঠানিক বংশাহার তারই ঘোষণামাত্র। আধুনিক ব্রতধারিণীরা নিশ্চয়ই আচারগুলির এ-ধরনের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত নন, ধারাবাহিক পরম্পরায় অর্জিত আচারগুলি তাদের কাছে নিয়মরক্ষা মাত্র। কিন্তু আচারগুলি যখন সৃষ্টি হয়, তখন যে আমাদের বর্ণিত যুক্তিধারাই অনুসৃত হয়েছিল, সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কম। ঋগ্বেদে পর্যন্ত স্ত্রীকে স্বামীহত্যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। বলা হয়েছে, 'অপতিঘ্ন এধি'।[৫৮] নির্দেশটা নিশ্চয়ই বস্তুভিত্তি বর্জিত ছিল না। পুরুষপ্রাধান্যের যুগে এ-জাতীয় রীতির প্রতিরোধকল্পেই হয়তো সতীদাহ-প্রথার সূচনা হয়েছিল।[৫৯]

৬

মহাভারতের কাহিনীতে সত্যবান সম্পর্কে আরেকটি ছোট তথ্য রয়েছে, যাকে এমনিতে অবান্তর বলেই মনে হয়। উল্লেখ রয়েছে, "আর শৈশব অবস্থায় অশ্ব ইহার প্রিয় ছিল, মৃন্ময় অশ্ব নির্মাণ করিত এবং চিত্রেও বিশেষভাবে অশ্ব চিত্রিত করিত। সেইজন্য ইহাকে চিত্রাশ্বও বলে।"[৬০] অর্থাৎ সত্যবানের অপর নাম ছিল চিত্রাশ্ব। তথ্যটি কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়ে আর উল্লিখিত হয়নি। শিল্প রচনার প্রসঙ্গও নয়, নামটিও নয়। তাই বলছি তথ্যটি আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর। কিন্তু বহুতর পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবর্তিত একটা অবয়বে যখন কোনো প্রসঙ্গ বাহুল্য হিসাবেও টিঁকে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে এর সঙ্গে সম্ভবত এমন কোনো মৌলিক ও বিশিষ্ট উপাদানের সংশ্রব ছিল, যাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। বহিরঙ্গে হলেও তাকে একটু জায়গা ছেড়ে দিতেই হয়েছে।

অনুমান করা চলে, সত্যবানের চিত্রাশ্ব নামটিকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্যই পরবর্তী পর্যায়ে অশ্বনির্মাণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ যোগ করা হয়েছে। সত্যবানের সঙ্গে অশ্বের একটা মৌলিক সংশ্রব ছিল, তথ্য হিসাবে এ-টুকুই গ্রাহ্য। সেই সঙ্গে আরেকটি কথা এসে পড়ে—সাবিত্রীর পিতার নামও ছিল অশ্বপতি। প্রশ্ন হচ্ছে, মাতা এবং কন্যা উভয়ের স্বামীর নামের সঙ্গে অশ্ব-সংশ্রব ঘটল কেন?

শুধুমাত্র নাম সাদৃশ্য থেকে স্থির নিশ্চয় কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। তবু মনে হয় অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্গে এর কিছু সম্পর্ক থাকা সম্ভাব্য। 'শ্রৌত সূত্র' 'শতপথ ব্রাহ্মণ' এবং 'বাজসেনীয় সংহিতা' গ্রন্থে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে যে-সমস্ত তথ্য রয়েছে, তা পর্যালোচনা করে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়[৬১] ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য[৬২] কিছু কৌতূহলপ্রদ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, 'শ্রৌতসূত্র' বলছে যে এই যজ্ঞের মূল আচার ছিল অশ্বের সঙ্গে রাজমহিষীর মিলন। নিহত অশ্বের পাশে রানীকে শয়ন করতে হতো। শুধু তাই নয়, রানী ও তার পরিচারিকাদের সঙ্গে পুরোহিতের অশ্লীল বাক্য বিনিময় হতো। শতপথ ব্রাহ্মণে রয়েছে যে রানী এই সময়ে অশ্বকে বীজবপনকারী, বীর্যবান পুরুষ ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করে বীজবপনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। বাজসেনীয় সংহিতার টীকায় এই সঙ্গমের বিশেষ পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে এবং কৃষকের বীজবপন কার্যের সঙ্গে অনুষ্ঠানটির তুলনা করা হয়েছে। রানীর মধ্যদেশ সিক্ত করা এবং রানীকে গর্ভবতী করাই যে অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য, সে-কথাও বলা হয়েছে।

এ-সমস্ত তথ্য থেকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত হচ্ছে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আদিম যে উদ্দেশ্য ছিল, পরবর্তীকালে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে।[৬৩] মূলত এটা ছিল উর্বরাশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি ধর্মাচার। একটা পর্যায়ে পুরোহিত-রাজা তথা সাময়িক স্বামীর বিকল্প হিসাবে অশ্ব ব্যবহারের প্রচলন হয়, রানীকে সেজন্যেই অশ্বের পাশে শয়ন করতে হত। রাজা অথবা পুরোহিতের বলিদানটা নারী-পুরোহিত-ভিত্তিক সাম্বৎসরিক ধর্মাচারেরই অঙ্গ ছিল। এই বলিদানের আগে রানীকে গর্ভবতী হতে হতো, যাতে পৃথিবী শস্যশালিনী হয়ে ওঠে। সোজা কথায় অশ্বমেধ যজ্ঞের আদিম অবস্থায় তাতে দেবীর প্রধানা পুজারিণীর (বা রানীর) সঙ্গে মিলনের পর সাময়িক স্বামী (বা পুরোহিত রাজা) বলিপ্রদত্ত হতেন।

অপরদিকে কোসাম্বী বলছেন যে অশ্বমেধ যজ্ঞ মূলত এমনতরো ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রাগার্য উপাদান ঢুকে পড়ায় এই ধরনের আদিম অনুষ্ঠান এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল। অর্থাৎ মূল অনুষ্ঠান ছিল অশ্ববলিরই, কিন্তু যেহেতু প্রাগার্য সমাজে সাময়িক প্রেমিককে বলিদানের রীতি ছিল, তারই অনুকরণে অশ্ব পরিণত হয়েছিল সাময়িক প্রেমিকের (বা রাজার) বিকল্পে।[৬৪] কোসাম্বী সংখ্যায়ন ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন, যেখানে সরাসরি মনুষ্য বলিদানের কথাই বলা হয়েছে

অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গে, এবং সেই মানুষটিকে রানীর সঙ্গে সঙ্গমও করতে হবে বলে বিধান দেওয়া রয়েছে তাতে।

যাই হোক, দুটি মতেই কিন্তু রাজা (বা রানীর সাময়িক প্রেমিক বা পুরোহিত) এবং অশ্বের মধ্যে একটি সম্পর্ক আরোপিত। অশ্ব এবং রাজা যে একে অন্যের বিকল্প এবং রাজবলিদান যে অশ্ববলির চাইতে প্রাচীন রীতি, এটা দুজনের বিশ্লেষণেই স্বীকৃত।

অশ্ব-অংশ বিশিষ্ট আরেকজন রাজার উল্লেখ আমরা পাই মহাভারতে, তার নাম ব্যুষিতাশ্ব। এই রাজার মহিষীর নাম ছিল ভদ্রা। অতিমাত্রায় স্ত্রী-সংসর্গহেতু ব্যুষিতাশ্ব বিবাহের অনতিপরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সন্তানহীনা ভদ্রা স্বামীর বিয়োগে কাতর বিলাপ করতে থাকলে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল :

"ভদ্রা মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃপুনঃ এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, 'হে বরারোহে! বিলাপ করিও না, গাত্রোত্থান করিয়া গমন কর। হে চারুহাসিনী, আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, তুমি চতুর্দশী বা অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া আমার সঙ্গে নিজ শয্যায় শয়ান থাকিবে, তাহা হইলে আমি স্বীয় শবে আবির্ভূত হইয়া তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিব।' এই অমৃতময় বচন-পরম্পরা শ্রবণে পতিব্রতা ভদ্রা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুত্রকামনায় যথোক্ত কার্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন এবং সেই শবসংসর্গে তিনজন শাল্ব ও চারজন মদ্র প্রসব করিলেন।"[৬২]

এখানে ব্যুষিতাশ্ব বলিপ্রদত্ত হচ্ছেন না বটে, কিন্তু বিবাহ ও পত্নীসংসর্গ যে তার মৃত্যুর কারণ, সে-কথাটি রয়েছে। শবরূপ ব্যুষিতাশ্বের সঙ্গে মহিষী ভদ্রা মিলিত হচ্ছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞে মৃত অশ্বের সঙ্গে মহিষীর রাত্রিযাপনের রীতিটা তারই রকমফের মাত্র। দু-ক্ষেত্রেই মৃতের সঙ্গে মিলনের মূল লক্ষ্য যে সন্তান-উৎপাদন, তাও অনুমানগ্রাহ্য। অশ্বমেধ যজ্ঞের একটি বিশিষ্ট আচারকে রাজা ব্যুষিতাশ্বের ঐ কাহিনীর সাহায্যে আরেকটু স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। অতিরিক্ত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হিসাবে আমরা পাচ্ছি মহিষী ভদ্রা মৃত ব্যুষিতাশ্বের মাধ্যমে যে সন্তানগুলি লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে তিনজন শাল্ব এবং চারজন ছিলেন মদ্র। জন্মসূত্রে চিত্রাশ্ব বা সত্যবান ও শাল্ব আর তার শ্বশুর তথা সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি ছিলেন মদ্র : অর্থাৎ ব্যুষিতাশ্ব, চিত্রাশ্ব ও অশ্বপতি—এরা জাতিগত বিচারে পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রত্যেকেই অশ্ব অভিধাটি বহন করছেন।

আমরা আগে দেখিয়েছি যে কন্যার জন্মের মাধ্যমে উত্তরাধিকার-প্রশ্নের

মীমাংসা হওয়াটা মাতৃপ্রাধান্যের সূচক এবং সাবিত্রীর জন্মের মাধ্যমে কার্যত তাই হয়েছিল। আবার মাতৃপ্রাধান্যের সঙ্গে দেবী-পূজা এবং দেবীর প্রধানা পূজারিণীর রানী-স্বরূপ প্রতিপত্তির সম্পর্ক রয়েছে। মেরলিন স্টোন বলছেন,

"The Divine right was probably originally not provided by a male-god, but by the goddess. And documentory and mythological evidence suggest that this right, rather than bestowed upon a male, was originally held by a woman, the high-priestess of the goddess, who may have gained the position by the custom of matrilineal descent. In the role of the high-priestess of the goddess, this woman may also have been regarded as queen or tribal ruler".[১৬]

অতএব সাবিত্রীর মতো তার মাতাকেও আমরা দেবীর মানবী-প্রতিভূ অথবা প্রধানা পূজারিণী হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। রানী হিসাবে তাঁর যে পরিচয়, তার আদি উৎসও সম্ভবত তাই। সেই সঙ্গে আমরা যদি এই তথ্যগুলি যোগ করি যে এই সমস্ত পূজারিণীর সাময়িক স্বামী বলিপ্রদত্ত হতেন, পূজারিণীদের উপর রানীদের মর্যাদা আরোপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাময়িক স্বামীরাও রাজমর্যাদা পেতেন, অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্যে পূজারিণী-সংশ্লিষ্ট উর্বরতাভিত্তিক ধর্মাচার অনুপ্রবিষ্ট, তাহলে রাজা এবং অশ্ব যে কোন প্রক্রিয়ায় একে অন্যের বিকল্পে পরিণত হয়েছেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। চিত্রাশ্ব, অশ্বপতি বা দ্যুমৎসেন নামগুলির মধ্যে তখন নতুন তাৎপর্যও খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

মনে হয় পূজারিণী-সংশ্লিষ্ট ধর্মাচারের ক্রমবিবর্তনের কোনো একটা পর্যায়ে বলিপ্রদত্ত রাজার সাধারণ অভিধা হিসাবে 'অশ্ব' শব্দটি সংযুক্ত হতো। সেটা অশ্বমেধ যজ্ঞের সংশ্রবেও হতে পারে, আবার অশ্বমেধ যজ্ঞ ব্যাপারটাই ঐ বিবর্তিত প্রবাহ থেকে উপজাত একটি বিকল্প অনুষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। যাই হোক, রাজন্যদের সঙ্গে অশ্ব অভিধাটির সংযোগ যে অনেক ক্ষেত্রেই একটি নৃশংস আচারের স্মারক, এমন অনুমান অগ্রাহ্য নয়। এ প্রসঙ্গে 'রোহিতাশ্ব' নামটিও স্মর্তব্য, এই রাজকুমারটিও তো জন্মসূত্রেই বলিপ্রদত্ত ছিলেন।

৭

সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান এবং তার সঙ্গে জড়িত ধর্মাচারের আদিম অবয়বটি

কবে গড়ে উঠেছিল, তা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা কঠিন। আমরা দেখিয়েছি যে ব্রতাচারের মধ্যে উদ্ভিদপ্রাণের পূজারও অবশেষ রয়ে গেছে। অর্থাৎ এদেশের মানুষ যখন খাদ্যসংগ্রহের যুগে ছিল, ব্রতাচারের কোনো কোনো আদিম উপাদান তার স্মৃতিও বহন করছে। কিন্তু সর্বত্রই এ ধরনের ধর্মাচার তার পরিণত রূপটি পেয়েছে কৃষির প্রাথমিক বিকাশের যুগে। উপাখ্যানগুলি গড়ে উঠেছে তারও পরে, ধর্মাচারের পরিপূরক হিসাবে।

কোসাম্বী মনে করেন যে খ্রীস্টপূর্ব তিনসহস্র অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব সপ্তদশ অব্দের মধ্যে ভারতের কৃষি-সভ্যতার প্রথম পর্যায়টি বিকাশ লাভ করে।[৬৭] অর্থাৎ মোটামুটিভাবে সেই সময়সীমাটা সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তৃতির কালপর্যায়ের সমসাময়িক। কোসাম্বী আরো মনে করেন যে সিন্ধুসভ্যতার কৃষিকাজ লাঙলের ব্যবহার ব্যতিরেকেই গড়ে উঠেছিল। তবে ব্রোঞ্জের তৈরি দাঁতযুক্ত ভারি কোদালজাতীয় যন্ত্র ব্যবহৃত হতো।[৬৮] অনুমান করা চলে, লাঙলের আবিষ্কারের আগেই, ভারি কোদালজাতীয় যন্ত্রের ব্যবহারের দরুন সিন্ধু সভ্যতার মধ্যপর্বেই নারীর হাত থেকে কৃষির চাবিকাঠি খসে পড়তে থাকে। তখন নিশ্চয়ই নতুন করে নারীকেন্দ্রিক কৃষি-সংশ্লিষ্ট যাদুক্রিয়ার আবির্ভাবের সুযোগ কমে গিয়েছিল। অতএব সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী ও ধর্মাচার এর আগেই পূর্ণাঙ্গ অবয়বটি পেয়ে গিয়েছিল, এমন অনুমান করা চলে। কাল পরিমাপের দিক দিয়ে সময় সীমাটাকে মোটামুটিভাবে খ্রীস্টপূর্ব তিন সহস্র অব্দ থেকে দুই সহস্র অব্দের মধ্যে ফেলা চলে।[৬৯]

আগে বলেছি, সিন্ধু সভ্যতার মধ্য পর্যায়েই সম্ভবত পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পূজারিণী-কেন্দ্রিক ধর্মাচার পুরুষ-প্রাধান্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এমন ভাবার কারণ নেই। গ্রীসের দৃষ্টান্ত দিয়ে কোসাম্বী বলেছিলেন যে, "Patriachal intrusion did not immediately abolish the sacred king's death by sacrifice even in Greece. A surrogate was first sacrificed in place of him and then perhaps symbolic puppets or totem animals substituted."[৭০]

আমাদের বিচার অনুসারে সাবিত্রীব্রত ও সংশ্লিষ্ট উপাখ্যানের মৌলিক রূপটি আনুমানিক পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। সিন্ধু সভ্যতার শেষপর্বেই তার সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। পরবর্তী তিন হাজার বছরে ভারতীয় সমাজদেহের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, কিছুটা বাইরের চাপে, কিছুটা অভ্যন্তরীণ বিবর্তন

প্রক্রিয়ায়। সাবিত্রীব্রত ও তৎসংশ্লিষ্ট উপাখ্যানও পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। দেখা যাচ্ছে, উপাখ্যান-অংশেই পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাপক এবং গভীর ; আদিম এবং যৌন উপাদানগুলি সেখানে প্রায় সম্পূর্ণই বর্জিত। এটা সম্ভবপর হয়েছে এই কারণে যে শিক্ষার সীমিত ব্যাপ্তির যুগে লিখিত সাহিত্যের কাজই ছিল সমাজের উপরি-কাঠামোর ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করা। ধর্মাচারের ব্যাপারে যৌন আচারগুলি কিছু অধিক পরিমাণে টিঁকে রয়েছে, কারণ আচারগুলি ছিল মেয়েদের বিশেষ অধিকারের এক্তিয়ারভুক্ত এবং মেয়েরা স্বভাবতই অধিকতর রক্ষণশীল। কোসাম্বী বলছেন, "In general, Indian women retain archaisms where the men show a cosmopolitan position due to more frequent contact with people outside the tribe or the caste group"[১১]

উল্লেখযোগ্য যে ধর্মাচার ও উপাখ্যানের প্রাচীন উপাদান বলে যেগুলোকে আমরা চিহ্নিত করছি এবং তার উপর যে-সমস্ত সংস্কার সাধিত হয়েছে বলে আমরা অনুমান করছি, তার মধ্যেও পর্যায়ভেদ রয়েছে। অর্থাৎ প্রাচীন উপাদানগুলো সব একযুগের নয়, আবার সংস্কারের কাজটাও একদিনে সারা হয়নি। পাঁচ হাজার বছর ধরেই পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের কাজটি চলেছে। একটা পর্যায়ে এসে যে উপাখ্যানটি মোটামুটি একটা নির্দিষ্টরূপে স্থিত হয়ে গেল, তার কারণ সামাজিক পরিবর্তনের প্রবাহ থেকে তা নিজেকে বিযুক্ত করতে পেরেছিল। সাবিত্রীব্রত যেহেতু এখনো সামাজিকভাবেই আচরিত হয়, অতএব তার মধ্যে গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়াটি আজও চলছে।

নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে উপাখ্যান ও ব্রতাচারের বিভিন্ন পর্যায়গুলির কালবিচার করাও সম্ভবপর।[১২] সে-ধরনের পর্যালোচনা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উন্মোচনে নতুন পথনির্দেশ করতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বস্তুত সেই সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিতান্ত প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবেই এ-আলোচনার অবতারণা।[১৩] বলা বাহুল্য, আমার প্রতিপাদ্য নতুন তথ্য ও নতুন যুক্তির আলোকে নিশ্চিতই সংশোধন-সাপেক্ষ।

নির্দেশপঞ্জি ও টীকা

১. Sir James Frazer, *The Golden Bough*, 1963, p 520

২. S. H. Hooke, *Middle Eastern Mythology*, 1976, pp 67-68

৩. ঐ, p 22

৪. ঐ, pp 39-40

৫. Verginia Fern (edited), *Encyclopaedia of Religion*, 1st edition, p 512

৬. ঐ, p 532

৭. ঐ, p 513

৮. Frazer, ঐ, p 428

৯. John Gray, *Near Eastern Mythology*, 1969, pp 86-89

১০. Frazer, ঐ, p 428

১১. Frazer, ঐ, pp 428-535

১২. (a) Albert Reville, *Native Religion of Mexico and Peru*, London, 1884. "All this shows once more how the same fundamental logic of the human mind asserts itself across a thousand diversities and reappears under every conceivable form in every climate and every race" , p 508

(b) Frazer, ঐ, "the similar causes acting alike on the similar constitution of human mind in different countries under different skies" ; p 505

১৩. Frazer, ঐ, p 643

১৪. James Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Magic*, Vol. XII, p 708

১৫. Frazer, ঐ, "The festival appears to have been essentially a festival of sowing, which properly fell at the time when the husbandman actually committed seed to the earth."— p 497

১৬. Hook, ঐ, p 17

১৭. Robert Brifault, *The Mothers*, Vol. III, p 2

১৮. ঐ p 64

১৯. Frazer, ঐ, p 67

২০. Brifault, ঐ, p 24. "The magical and religious rites intended to secure the fertility of the field were naturally within the special competence of the women who cultivated them and whose fertility was linked with earth. Many of women's religious associations were doubtless concerned originally with discharging that important function".

২১. George Thompson, *Studies in Ancient Greek Society*, 1939, p 210. "After the introduction of cattle-drawn plough, agriculture was transferred to man. In parts of Africa, where plough is only a recent acquisition, the changeover can be seen taking place at the present day".

২২. Merline Stone, *Paradise Papers*, 1976, pp 78-119

২৩. N. N. Bhattacharyya, *Indian Mother Goddess*, 1981, – p. 72. "The special vigour to overthrow mother-right must have necessarily implied, as Enphrenfels rightly claims a corresponding special vigour which mother-right must have been enjoying in India since pre-vedic days."

২৪. আসামের উত্তর-কাছাড় জেলার ডিমাছা'রা গো-পালনের সম্পূর্ণ বিরোধী। সেখানকার সরকারী ডেয়ারি-ফার্মের গোরুগুলিকে পর্যন্ত জনজাতীয় ডিমাছা'রা সুযোগ পেলে মুক্ত করে দেন। তাঁদের বিশ্বাস, কৃষিকাজে গবাদি পশু ব্যবহার করলে অনাবৃষ্টিতে শস্যহানি অনিবার্য। বলা বাহুল্য, কৃষিজীবী এই জনজাতি চাষবাসে লাঙল ব্যবহার করেন না, খুন্তি (hoe) বা ঐ জাতীয় জিনিসের সাহায্যে জুমচাষ করেন।

২৫. Frazer, ঐ, chapters XIV-XVIII

২৬. ঐ, pp 467, 477, 516

২৭. Robert Greaves, *Greek Myths*, Vol. 1. pp 14, 52, 232, 126

২৮. D. D. Kosambi, Myth and Reality, 1983, p 76

২৯. Greaves, ঐ, p 179

৩০. Merline Stone, ঐ, p 147. "Records from Nigeria report that a male was the consort of the queen until she found herself pregnant, at which time he was strangled by a group of women—he had fulfilled his earthly task. Numerous accounts, legends and fragments of texts and prayers suggest that there were similar practice in most of the goddess-worshipping countries...there are pieces of evidence that suggest that in neolithic and perhaps in earliest historical periods the consort of the high-priestess met a violent death wile she remained in grief."

৩১. *Proceedings of the Twenty-sixth International Congress of Orientalists*, Vol. II, 1968, Samuel Noah Krammer, *The Sacred Marriage*, p 191.

৩২. Kosambi, ঐ, pp 42-81

৩৩. Kosambi, ঐ, "Pururava to be sacrificed after having begotten a son and successor upon Urvasi ; he pleads in vain against her determination. This is quite well-known to anthropologists as a sequel to some kinds of primitive sacred marraige. The dialogue of Urvasi and Pururava is meant to be part of ritual act performed by two characters representing the principals and is thus a substitute for an earlier, actual sacrifice of the male." pp 54-55

৩৪. Kosambi, ঐ, p 3

৩৫. হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী, ৩য় পর্ব, পৃ ২৯০

৩৬. Ramila Thapar, *Ancient Indian Social History*, 1984, p 17

৩৭. S. Levi and others, *Pre-Aryan and Pre-Dravidian*, p 38

৩৮. Sudhakar Chattapadhyaya, *Racial Affinities of Early North Indian Tribes*, 1973, p 85

৩৯. S. Levi, ঐ

৪০. 'লোকায়ত দর্শন' থেকে উদ্ধৃত, পৃ ২২৩-২৪

৪১. ঐ, পৃ ২২৬-২২৮

৪২. Frazer, ঐ, p 202,—"tales of this sort (এদের জন্মবৃত্তান্ত) mean no more than that a woman has been gotten with child by a man unknown, and the uncertainty as to the fatherhood is more easily compatible with a system of kinship which ignores paternity than with one which makes it all important. If at the birth of the Latin kings their fathers were really unknown, the fact points rather to a general looseness of life in the royal family or to a special relaxation of moral rules on certain occasions, when men and women reverted for a season to the license of an earlier age. Such Saturnalias were not uncommon at some stages of social evolution."

৪৩. 'লোকায়ত দর্শন' পৃ ২২৫-২৮

৪৪. মহাভারত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ

৪৫. ঐ

৪৬. N. N. Bhattacharyya, ঐ, p 10

৪৭. Romila Thapar, *Early Indian Historical Traditions*, compiled in *History and Society*, Essays offered in honour of Nihar Ranjan Roy, p 278.—"That one of the royal lineages was born from a female form was rather galling in later times when women were of low social status and on per with the sudras. This is sought to be explained in '*Vishnupurana*' by the statement that during the course of the sacrificial ritual there was an inaccuracy, and although Manu had been performing the sacrifice for obtaining of sons, a daughter was born."

৪৮. মহাভারত, সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ

৪৯. ঐ

৫০. ঐ

৫১. John Gray, *Near Eastern Mythology*, p 43

৫২. ঐ p 22

৫৩. ঐ p 43

৫৪. ঐ

৫৫. Stone, ঐ, p 155

৫৬. Frazer, ঐ, p 496

৫৭. Stone, ঐ, p 155

৫৮. ঋগ্বেদ, ১০, ৮৫, ৫৪

৫৯. Kosambi, ঐ, p 80

৬০. সিন্ধুবাসীদের অবদান

৬১. D. P. Chattapadhyaya, *Lokayata*, p 294

৬২. N. N. Bhattacharyya, ঐ, pp 124-27

৬৩. ঐ, p 42 , "In the Aswamedh sacrifice, in which the original purpose of the aforesaid rite is distorted to a considerable extent, we find the use of horse in place of the priest-king. The queen had to lie with the horse. The killing of the king or the priest was nothing but an incident in the women's ritual cycle." এবং ঐ, p. 127, "...it was necessary for her to conceive in order that the earth might bear fruit."

৬৪. Kosambi, *The Origin of Brahmin Gotras*, Journal of Asiatic Society, Bombay, 1950, p 80 , The Yajurvedic Asvamedha lets the horse go free for a year, makes his wandering the excuse for military aggression and imposing upon the queen the revolting duty of copuling with the slain victim to the accompaniment of obscene discourse. The sacrifice has become a fertility rite, though now accompanied by a large number of other victims. The still later Sankhyayana Srauta Sutra replaces the horse by a human victim with the same freedom for a year and the same duty imposed upon the queen. This shows clearly that the successive

substitions are for the original annual sacrifice of the queen's consort, the development is apparently in the wrong order, as explained, simply because of progressive assimilation of pre-Aryan customs with advancing settlement."

৬৫. মহাভারত, আদিপর্ব, ১২১ অধ্যায়

৬৬. Stone, ঐ, p 144

৬৭. Kosambi, *Culture and Civilization of Ancient India*, 1977, p 51

৬৮. Kosambi, *An Introduction to the Study of Ancient India*, 1975, p 68

৬৯. সাবিত্রীব্রত বা সমজাতীয় ধর্মাচার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত থেকে এ কথা বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত ব্রোঞ্জযুগীয় সভ্যতার সঙ্গে এ-জাতীয় আচারের সম্পর্ক রয়েছে; লোহার প্রচলনের পর সমাজে পুরুষপ্রাধান্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়। সিন্ধু সভ্যতা ব্রোঞ্জযুগীয় এদেশে প্রাচীনতম কৃষি-সভ্যতা। সে-কারণেই আমরা সাবিত্রীব্রতকে সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে চাইছি। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তের একটি ধর্মাচার পূর্বতম প্রান্তে তার আদিম অবশেষ নিয়ে টিঁকে থাকল কীভাবে, সে-প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। এ-প্রশ্নের জবাবে বিস্তর যুক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব, কিন্তু সেটা একটা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় হয়ে যাবে। আপাতত এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে ভারতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত হয়েছিল এবং বিশেষ করে সুরমা-বরাক উপত্যকায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদিমতম বাহকরা যে পশ্চিম ভারত থেকে এসেছিলেন, তার ঐতিহাসিক নিদর্শনও বর্তমান। সাবিত্রীব্রত ব্রাহ্মণ ও অন্য বর্ণহিন্দুদের অনুষ্ঠান। এঁরা কৃষিনির্ভর, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে নিজেরা কৃষিজীবী নন। তাছাড়া, প্রান্তবর্তী এলাকায় বিবর্তন-প্রবাহ দেরিতে কাজ করে, সে কারণে শ্রীহট্টঅঞ্চলে অনেক প্রাচীন আচারই টিঁকে রয়েছে, যা আমাদের সামাজিক ইতিহাস রচনার ব্যাপারে **missing link**-এর ভূমিকা পালনে সক্ষম।

৭০. Kosambi, *C. C. A. I.* p 147

৭১. ঐ, p 47

৭২. **"A true science of myth should begin with a study of**

archaeology, history and comparative religion".—Robert Greaves, *Greek Myths*, Vol. I, p 21

১৩. সাবিত্রীব্রত ও সাবিত্রী-উপাখ্যান সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন বি. এ. গুপ্তে তাঁর *Hindu Holidays and Ceremonies (1919)* গ্রন্থে। তিনি যথাযথই নির্দেশ করেছিলেন যে এটা nature myth এবং এর মধ্যে প্রকৃতির বাৎসরিক ক্ষয় এবং পুনরুজ্জীবনের সংকেত রয়েছে। কিন্তু বিষয়টিকে বিস্তৃত যুক্তিধারা সহযোগে তিনি পর্যালোচনা করেননি। ব্রতের আচার সম্পর্কে তিনি কোনো বিবরণ দেননি। দশপৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন একটি মণ্ডল বা আলপনার উপর, যা সাবিত্রীব্রত উপলক্ষে আঁকা হতো (কোন্ অঞ্চলে তার উল্লেখ তিনি করেননি)। এই মণ্ডলের বিভিন্ন সংকেত ও চিত্রের তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন মুখ্যত জ্যোতিষ ও গ্রহ-সংস্থানের আলোকে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে এটি একটি Sun-myth। তাঁর বিশ্লেষণ আমাদের কাছে সারবস্তুপূর্ণ বলে মনে হয়নি। কিন্তু প্রসঙ্গটি সম্পর্কে নতুন চিন্তার তিনিই যে প্রথম পথিকৃৎ, সে-সত্য স্বীকার্য।

কার্তিকেয় : প্রতিহত দেবসেনাপতি

বর্তমান চেহারায় কার্তিক ঠাকুরের রূপটি ঊনবিংশ শতকের মধ্যবাবুর আদলেই অঙ্কিত। আদিম পর্যায়ে এই দেবতার চরিত্র কিন্তু আরেকটু বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। প্রাচীন সাহিত্য, পুরাণ এবং ইতিহাসে সে বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এমন কি এ যুগের লোকায়ত ধর্মাচার এবং লোকশ্রুতিতেও কার্তিক চরিত্রের বৈচিত্র্যময় অবশেষ কিছু পরিমাণে বর্তমান। এমনই একটি ধর্মাচার এবং তৎসংশ্লিষ্ট লোকশ্রুতিই এই আলোচনার প্রারম্ভিক প্রেরণা।

সুরমা-বরাক উপত্যকায় কার্তিক পূজা খুব একটা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান নয়, তবু কিছু কিছু সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতে এর প্রচলন রয়েছে। এ পূজার অনুষঙ্গ হিসাবে বাড়ির মেয়েরা তখন অন্য একটি অনুষ্ঠান করেন। পূজার পক্ষকাল আগে মেয়েরা মাটির সরার উপর কাদামাটির পুরো আস্তরণ দিয়ে একটি নকল ধানক্ষেত তৈরি করেন। তাতে বীজধান পোঁতা হয়, প্রত্যহ জলসিঞ্চন করে তার পরিচর্যা হয়। দিন-কয়েক পর চারাগুলো উঁকি দেয় এবং পূজার দিন নাগাদ চারাগাছগুলো বেশ ডাগর হয়ে ওঠে। পূজার দিনে মাটি কিংবা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে একটা পুতুল তৈরি করা হয়, পুতুলটিকে শাড়ি গয়না পরিয়ে বধূবেশে সাজানো হয়, তার পর তাকে লুকিয়ে রাখা হয় ঐ সরার ধানখেতে। সরাটা পূজার অন্যান্য উপাচারের সঙ্গে কার্তিকমূর্তির সামনে রেখে দেওয়া হয়, যদিও পুরোহিতের ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ঐ সরার কোনো সংস্রব থাকে না। সন্ধেবেলা মেয়েরা দল বেঁধে সরাটিকে বয়ে নিয়ে যায় পুকুরঘাটে কিংবা নদীতে, সেখানে সরাটি বিসর্জিত হয়। ধানবীজ পোঁতা থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সমগ্র অনুষ্ঠানটাই থাকে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে, পুরুষের এতে কোনো ভূমিকা থাকে না।

এই অনুষ্ঠানটির ব্যাখ্যা হিসাবে নারী মহলে একটা কিংবদন্তী চালু রয়েছে, সেটাও কৌতূহলপ্রদ। দানবদের পরাজিত করে কার্তিক যখন ঘরে ফিরছিলেন, তখন এক রূপবতী দেবকন্যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কন্যাটির নাম ঊষা। রূপমুগ্ধ কার্তিক মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইলে সে রাজী হয়। ঊষাকে নিয়ে কার্তিক পৌঁছলেন কৈলাসের কাছাকাছি। তখন কার্তিকের মনে হলো যে মাকে জিজ্ঞেস না করে সরাসরি ঊষাকে নিয়ে ঘরে তোলা ঠিক হবে না। নীচে এক ধানখেতে ঊষাকে অপেক্ষা করতে বলে কার্তিক গেল মায়ের অনুমতি চাইতে। ঊষা অপেক্ষায়

রইলেন। কার্তিক কৈলাসে গিয়ে দেবী দুর্গাকে তাঁর মনোবাসনা জানালেন। দেবী মৌখিক অনুমতি দিলেন কিন্তু সেটা খুশি মনে কিনা, তা লক্ষ্য করার মতো অবসর কার্তিকের ছিল না। দ্রুত বরবেশে সেজে কার্তিক বেরিয়ে যাবেন, হঠাৎ মনে হলো মাকে প্রণাম করে যাওয়া উচিত। কিন্তু এ ঘর ও ঘর ঘুরে মাকে আর তিনি খুঁজে পান না। শেষ পর্যন্ত দুর্গাকে পাওয়া গেল রান্নাঘরে। দেবীর সামনে একটি বিরাট মহিষ, রান্না করার তর সয়নি, দেবী দু' হাত দিয়ে কাঁচা মাংস গোগ্রাসে গিলছেন। এ বীভৎস দৃশ্য দেখে কার্তিক আতঙ্কে উঠলেন, "মা, এ তুমি কি করছ?" দুর্গা জবাব দিলেন, "বাবা, এখন তো বউ ঘরে আসবে, কোনোদিন খেতে দেবে, কোনোদিন দেবেই না, তাই সাধ মিটিয়ে শেষ খাওয়া সেরে নিচ্ছি।" হতভম্ব কার্তিক মায়ের যথার্থ মনোভাবটি বুঝতে পারলেন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে জীবনে আর বিয়েই করবেন না। এদিকে উষা ধানখেতে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু কার্তিক আর আসেন না। দিনের পর দিন যায়, কার্তিক নিরুদ্দেশ। শেষ পর্যন্ত নানা কান হয়ে কার্তিকের প্রতিজ্ঞার খবর উষার কাছে পৌঁছল। হতাশায় লজ্জায় উষা প্রতিজ্ঞা করলেন যে তার পোড়ামুখ আর কাউকে দেখাবেন না, চিরদিন ধানখেতেই লুকিয়ে থাকবেন।

মেয়েরা যে পুতুলটি তৈরি করেন, সে হচ্ছে ঐ উষা। বধূবেশে তাই তাকে ধানখেতে লুকিয়ে রাখা হয়। মেয়েদের মতে ঐ অনুষ্ঠানটি হচ্ছে কার্তিকের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের স্মারক। সেইসঙ্গে যে কথাটি তারা জুড়ে দেন, তা হলো পরে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কার্তিক উষাকে নিতে এসেছিলেন, কিন্তু লুকাইত উষাকে খুঁজে আর পাননি।

২

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে যাদের আগ্রহ রয়েছে তাঁরাই জানেন যে মাটি, পাথর বা অনুরূপ বস্তু দিয়ে তৈরি ছোট পাত্রে কৃত্রিম ধানখেত বা শস্যখেত তৈরি করা একটি সুপ্রচলিত প্রথা, জগৎ জুড়ে এককালে এর প্রচলন ছিল। পশ্চিম এশিয়া এবং গ্রীসে অ্যাডোনিস-এর পূজার সংগবে এ-ধরনের শস্যক্ষেত্র ব্যাপকভাবে তৈরি করা হতো বলে এর সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাডোনিস গার্ডেন (Adonis' Garden)।[১] সরা বা রেকাবজাতীয় পাত্রে এই কৃত্রিম খেত তৈরি করা হয় বলে একে 'সসার গার্ডেন'ও (Saucer Garden) বলা হয়। ফ্রেজার ছাড়াও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শরৎকুমার রায় অ্যাডোনিস গার্ডেনের বহু

ভারতীয় দৃষ্টান্তের কথা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সকলেই এবিষয়ে একমত যে অ্যাডোনিস গার্ডেন তৈরি করে যে-সমস্ত মেয়েলি ধর্মাচার পালিত হয়, সেগুলো মূলত উর্বরতাশক্তির উদ্বোধনের জন্য আচরিত এক ধরনের কৃষিভিত্তিক জাদুক্রিয়া।

পশ্চিমবঙ্গে ইতু পূজায় অ্যাডোনিস গার্ডেন তৈরি করা হয়। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কার্তিক পূজার সংস্রবেই যে অ্যাডোনিস গার্ডেন ব্যবহৃত হয়, তার একটা কৌতূহলপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন। চুঁচুড়ায় গণিকারা কার্তিক পূজা করেন এবং সেই সময়ে তাঁরা ঐ ধরনের কৃত্রিম শস্যক্ষেত তৈরি করেন। ঐ বিবরণের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জায়গায়ও কার্তিক পূজার সংস্রবে অ্যাডোনিস গার্ডেনের প্রচলনের উল্লেখ পাই।[১] অর্থাৎ দেবসেনাপতি কার্তিকের পূজায় একটা কৃষিভিত্তিক জাদুক্রিয়া যে সন্নিবেশিত হয়েছে, তথ্য হিসাবে কৌতূহলপ্রদ হলেও এটা সুরমা-বরাক উপত্যকারই কোনো বিরল বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু অন্যত্র যা নেই, এবং এক্ষেত্রেও রয়েছে, তা হলো লোকশ্রুতির মাধ্যমে হস্তান্তরিত একটা মেয়েলি কিংবদন্তী। সামাজিক বিবর্তন প্রবাহের একটা স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে, ধর্মাচার এবং সংশ্লিষ্ট কিংবদন্তীর মধ্যে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করা, তাই কদাচিতই দুটোর যৌথ উপস্থিতিকে পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া যায়। এই অসুবিধার কথা উল্লেখ করেই ফ্রেজার বলেছেন যে সাধারণভাবে ধর্মাচার এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিংবদন্তী দুটোই যদি টিঁকে থাকে, তবে একটির সাহায্যে অপরটির বিশ্লেষণ এবং চরিত্র নির্ধারণ সম্ভবপর হয়।[২] ফ্রেজারের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই আধুনিক নৃতত্ত্ববিদরা বাতিল বলে গণ্য করেন, কিন্তু অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ধর্মাচার এবং কিংবদন্তীর পারস্পরিক সম্পর্ক-বিষয়ক তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি যে গভীর অভিনিবেশের দাবি রাখে, আমাদের আলোচনায় তা স্পষ্ট হবে।

কার্তিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা স্বীকৃত একজন দেবতা। তাঁর পূজা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারেই সম্পন্ন হয়। মেয়েদের তৈরি করা নকল ধানখেতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় পূজার কোনো সম্পর্ক নেই, বস্তুত ব্রাহ্মণ পুরোহিত অন্যান্য উপচারের মধ্যে রক্ষিত ঐ সরাটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করেন। মেয়েরা কিন্তু অসীম নিষ্ঠায় ধানখেতটি তৈরি করেন, উষারূপী পুতুলটিকে যত্ন করে সাজান, উষাকে জলে ভাসিয়ে বিষণ্ণ হৃদয়ে ফিরে আসেন। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মাচারের একটি দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত এখানে আমরা অনায়াসে লক্ষ্য করি। কিন্তু কি সেই দ্বন্দ্ব? কি তার সামাজিক প্রেক্ষাপট? এখানে এসে কিংবদন্তীটি আমাদের কাজে লাগে। বিবাহের ব্যাপারে কার্তিকের অনিচ্ছা এবং পরবর্তী পর্যায়ে উষার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া কিংবদন্তীটির

দুটি যৌন উপাদান। ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বীর মতে বৈধ বিবাহগুলো মূলত দুটি বিপরীতধর্মী সমাজের সমন্বয়ের রূপক।[৪] একই যুক্তিধারা অবলম্বন করে বলা যায় এই বিবাহ সেই ধরনের সমন্বয় প্রয়াসের ব্যর্থতার বার্তাটি বহন করে।

অতএব কার্তিক এবং উষাকে আমরা দুটো বিপরীতধর্মী সমাজধারণের প্রতিনিধিরূপে ধরে নিতে পারি। গোটা সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতটাই তা হলে সামাজিক—ধর্মাচার তাকে আবৃত করেছে মাত্র। সামাজিক এই সংঘাতের পটভূমি আরেকটু স্পষ্ট হবে, যদি কার্তিক সম্পর্কে স্থানীয় নারীসমাজের মানসিকতাটি আমরা অনুধাবন করি। সুরমা-বরাক উপত্যকার নারী সমাজের কাছে কার্তিক খুব একটা ভক্তিভাজন দেবতা বলে স্বীকৃত নন। বরং বিপরীতটাই সত্য। এখানকার কুমারী মেয়েরা কার্তিককে প্রণাম করেন না, সে কাজটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং সে নিষেধাজ্ঞা খুব কঠোরভাবেই পালিত হয়। লোকবিশ্বাস এই যে, কার্তিককে প্রণাম করলে কুমারী মেয়েদের বিয়ে হয় না। বিবাহিতা নারীরা কার্তিককে প্রণাম করেন সত্য, কিন্তু শুধুমাত্র সন্তানের মঙ্গল কামনায়, অন্য কোনো কামনা কার্তিককে নিবেদন করাও নিষিদ্ধ। সাধারণভাবেই নারীরা কার্তিক পূজায় সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন না, নৈবেদ্য সাজানোতে পর্যন্তও নয়। উষা-সম্পর্কিত আচারটির কথা স্বতন্ত্র, সেটা মেয়েদেরই ব্যাপার।

এই মনোভাব শুধু স্থানীয় নয়, শুধু সমকালীনও নয়। মহারাষ্ট্রে কার্তিকস্বামীর পূজায় মেয়েদের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ।[৫] মহীশূরের সন্দুরে কার্তিক বা কুমারস্বামীর সুপ্রাচীন মন্দির রয়েছে, সেখানে মেয়েদের প্রবেশাধিকার নেই।[৬] দেশের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে একই মানসিকতার এই বিস্তার নিশ্চিতই তাৎপর্যপূর্ণ। কালবিচারেও দেখা যায় যে এই মানসিকতার ইতিহাস সুপ্রাচীন। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'-তে পাই, কার্তিকের বন ছিল নারীদের নিকট নিষিদ্ধ এবং উর্বশী সেখানে অনধিকার প্রবেশ করে লতায় পরিণত হয়েছিলেন।[৭] 'কথাসরিৎসাগর'-এও নারী সম্পর্কে কার্তিকের বীতরাগের উল্লেখ রয়েছে। 'শিবলীলামৃত' নামক একটি প্রাচীন মারাঠী গ্রন্থে সতর্কবাণী রয়েছে যে, কোনো নারী যদি কার্তিকের দিকে দৃকপাত করেন তবে সাতজন্ম তাকে বৈধব্যভার বহন করতে হবে।[৮] মধ্যভারতে প্রায় দশম শতকের একটি রাজকীয় লিপিতেও কার্তিককে নারীদের সম্পর্কে নিস্পৃহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯]

এই-সমস্ত তথ্য এবং বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোথাও কার্তিক বর্জন করেছেন নারীদের, কোথাও নারীরাই বর্জন করেছেন কার্তিককে। অর্থাৎ যে দ্বন্দ্বটা অন্তর্লীন,

সেখানে ছ'জনেরই সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে, হয়তো স্থান ও কাল বিশেষে কখনও এ পক্ষ, কখনও ও পক্ষ অধিকতর আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ। মূল যে কথাটা এখানে অনায়াসে আবিষ্কারযোগ্য তা হলো যা দুর্গার সংসারের ক্ষুদ্রতার এই দেবতাটি মূলত একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব এবং দেব সমাজে তার আবির্ভাব এবং অস্তিত্বেক বেশ একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

৩

এই জটিলতার উৎস যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বপ্রথম দেবতারূপে কার্তিকের উদ্ভব হয়েছিল, তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত। এ তথ্যটি সুপরিজ্ঞাত যে যৌধেয় নামক একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠী কার্তিককে সর্বপ্রথম তাদের অধীশ্বর দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।[১০] পাণিনি যৌধেয়দের উল্লেখ করেছেন, অতএব এরা যে একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে অন্তত ট্রাইবেল রিপাবলিকের রূপ নিয়েছিল এবং সাময়িক বিপর্যয়ের কথা বাদ দিলে সমুদ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত এই রিপাবলিক তাদের সগৌরব অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এদের মুদ্রায় কার্তিকের মূর্তি থাকত এবং তাঁকে রাষ্ট্রের অধীশ্বর হিসাবে বর্ণনা করা হতো। সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের মতে এদের বিচরণভূমি ছিল আধুনিক হরিয়ানা জেলার রোতাস গ্রামে।[১১] মহাভারতে নকুলের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে রোহিতক (রোতাস) বাসী 'মত্তময়ূর' বলে একটি জনগোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে, এই মত্তময়ূর এবং যৌধেয়রা অভিন্ন ছিল বলেই অনুমিত হয়।[১২] 'মত্তময়ূর' অভিধাটি লক্ষণীয়। সম্ভবত ময়ূর এদের টোটেম ছিল এবং কার্তিক এই টোটেম থেকেই তার বাহনটিকে অর্জন করেছেন।

দেবতাদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব তাদের উপাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবাদর্শ-দ্বারাই নিরূপিত হয়। আবার সে দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শ গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠির জীবনচর্যার পটভূমিতে। অতএব কার্তিক চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিশ্চিতই যৌধেয়দের জীবনচর্যা এবং তৎপ্রসূত ভাবাদর্শদ্বারা প্রভাবিত ছিল। যৌধেয়দের সামাজিক গঠন সম্পর্কে বিস্তৃত জানার সুযোগ নেই, কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য থেকে দু-একটা সাধারণ লক্ষণ নির্ণয় করা সম্ভব। যৌধেয় অভিধাটি থেকেই বোঝা যায় যে যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তদুপরি পাণিনি এদের 'আয়ুধ-জীবী' বলেও উল্লেখ করেছেন। তা হলে দাঁড়ায় এরা ছিল অস্ত্রজীবী। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলছেন যে আয়ুধজীবী বলতে এখানে অস্ত্র ব্যবসায়ী বোঝাচ্ছে না,

বোঝাচ্ছে শিকারজীবী।[১৩] বস্তুত শিকারজীবী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোদ্ধা জনগোষ্ঠীর পার্থক্যটা মূলত কালপর্যায়ের মাত্র। কৃষি-অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ না করলে শিকারজীবীরাই সাধারণত অস্ত্র ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়। যৌধেয় এবং আয়ুধজীবী—এ দুটো অভিধা থেকে আমরা অনায়াসে এই অনুমান করতে পারি যে এরা শিকারজীবী, যুদ্ধপ্রিয়, দুর্ধর্ষ, অর্ধ-উপজাতীয় পর্যায়ের জনগোষ্ঠী ছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে এ ধরনের অনেকগুলি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বর্তমান ছিল। শিকার এবং লুণ্ঠন এদের বৃত্তি ছিল, আবার প্রশিক্ষণ দিলে সৈনিক হিসাবে এরা যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম ছিল।

শিকারজীবী সমাজ থেকে উদ্ভূত এই ধরনের লুণ্ঠনলিপ্সু, রণপটু, দুর্ধর্ষ উপজাতীয় সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান থাকে বিড়ম্বিত। শারীরিক দৌর্বল্যের দরুন দুঃসাহসিক অভিযানের সময় নারীরা এদের সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া সাদৃশ্যমূলক ইন্দ্রজালের প্রতি যে অগাধ বিশ্বাস এই ধরনের সমাজে সতত সক্রিয়, তাতে নারীকে এরা দৌর্বল্যের কারক বলেও বিবেচনা করে। দৃষ্টান্ত দিয়ে ফ্রেজার বলেছেন, 'বর্বর উপজাতীয়রা (Savage) যুদ্ধের সময়ে কেন যে নারীসঙ্গ বর্জন করে, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। কিন্তু অনুমান করা চলে যে সাদৃশ্যমূলক ইন্দ্রজালে বিশ্বাসসঞ্জাত কুসংস্কার থেকে তারা মনে করে যে ঐ সময়ে নারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে নারীসুলভ দুর্বলতা ও ভীরুতা দ্বারা তারাও প্রভাবিত হবে। তাই কোনো কোনো উপজাতির বিশ্বাস যে শৈশবে বেশি সময় নারী-সান্নিধ্যে অতিবাহিত করলে যোদ্ধাদের সাহস কমে যায়, এমন-কি তাদের অস্ত্রের কার্যকারিতাও হ্রাস পায়। তাই মধ্য বোর্নিয়োর কয়াক (Koyak) উপজাতীয়রা মনে করে যে যদি কোনো পুরুষ শিকার কিংবা যুদ্ধের আগে নারীর বস্ত্র, এমন কি নারীচালিত তাঁতও স্পর্শ করে, তবে তারা এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে অভিযানে ব্যর্থতাই তাদের বিধিলিপি হয়ে দাঁড়ায়।'[১৪]

নারী সমাজের প্রতি কার্তিকের যে মনোভাব, তা আমরা এই সমস্ত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মানসিকতা দিয়েই উপলব্ধি করতে পারি। যে উপজাতীয় গোষ্ঠীর নাম যৌধেয় এবং যারা বৃত্তিতে আয়ুধজীবী, তারা নিশ্চয়ই একটা পর্যায়ে ফ্রেজার-বর্ণিত উপজাতিদের সমগোত্রীয় ছিল। যে ধরনের সমাজে নারী-সংসর্গ যুদ্ধ এবং শিকারে ব্যর্থতার কারক হিসাবে স্বীকৃত, সেখানে সমাজের অধীশ্বর দেবতার মধ্যে যে নারী-সংসর্গ বর্জনের একটা প্রবণতা থাকবে, এটা স্বতঃসিদ্ধ। কার্তিকের কৌমার্য এই মানসিকতারই পরিশীলিত আরোপণ। কোনো কোনো প্রাচীন বর্ণনায় কার্তিককে

যে যোগীশ্বর এবং ব্রহ্মচারী অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে, সেগুলো এই পরিশীলিত আরোপণেরই অন্ত্য রূপ।

৪

যৌধেয়দের শিকারজীবী ও রণলিপ্সু উপজাতীয় পর্যায়ের মানুষ বলে মেনে নিলে নারীসমাজ সম্পর্কে কার্তিকেয় অনীহার প্রেক্ষাপটটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু বিপরীত প্রান্তে নারীসমাজও কেন কার্তিককে পরিহাসযোগ্য মনে করতেন কিংবা এখনও করেন, সে রহস্যের উন্মোচন তাতে সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে আমাদের অন্যত্র দৃক্‌পাত করতে হবে।

যৌধেয়দের আদি উল্লেখ রয়েছে পাণিনিতে। পাণিনির কাল সঠিক রূপে নির্ধারিত হয়নি, সাধারণত তাঁকে বুদ্ধের পূর্ববর্তী বলে ধরে নেওয়া হয়। তাঁর বর্ণনায় 'আয়ুধজীবী' কথাটির সঙ্গে 'সঙ্ঘ' শব্দটি থাকায় ধরে নেওয়া যায় তখনই তারা ট্রাইবেল রিপাবলিক হিসাবে সংগঠিত। পাঞ্জাব-হরিয়ানার পূর্বপ্রান্তে আরো আগে থেকেই তাদের বসবাস ছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, এরা যখন শতদ্রু তীরে ছিল, তখন তাদের প্রতিবেশী কারা ছিল? কী ছিল তাদের উপজীবিকা ও তৎসঞ্জাত মানস সংস্কৃতি? আমরা জানি যে হরাপ্পা সংস্কৃতি সন্নিহিত অঞ্চলেই বিকশিত হয়েছিল এবং তার ভিত্তি ছিল কৃষি। এই কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি হরাপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও নিশ্চিতই সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়নি, উত্তরাধিকারের একটা ধারা বরাবরই বহমান ছিল। বিভিন্ন সূত্রে মদ্রক, মালব, শাল্ব এবং বাহীকদের আমরা যৌধেয়দের প্রতিবেশী হিসাবে দেখি। এদের অনেকেই পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় পরিচিতি লাভ করলেও মূলত যে এরা মাতৃপ্রধান কৃষিজীবী সমাজ সংগঠন গড়ে তুলেছিল, তার অবশেষগুলি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন।[১৫]

খুবই সম্ভব যে এই সমস্ত কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ছিল। রবার্ট ব্রেফল্ট খুবই বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন যে আদিম কৃষিজীবী সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল সমধিক এবং পরবর্তী পর্যায়েও নারীর বিশিষ্ট মর্যাদা অনেকদিন পর্যন্ত এ ধরনের সমাজে টিঁকে ছিল।[১৬] এর কারণ হিসাবে বলা হয় প্রথমত আদিম কৃষিকাজ মেয়েদেরই আবিষ্কার। দ্বিতীয়ত, জমির উর্বরতা এবং নারীর সন্তানধারণ ক্ষমতাকে আদিম চিন্তায় এক এবং অবিচ্ছেদ্য বলে গণ্য করা হতো। এই সাদৃশ্য থেকেই মনে করা হতো যে নারীরাই কৃষি-সংক্রান্ত জাদুক্রিয়ার

অধিকারী, কারণ তারাই উৎপাদনের মূল রহস্যটি জানে। তাই নারী-পুরোহিতের মাধ্যমেই এই সমস্ত সমাজের ধর্মাচারগুলো সম্পন্ন হতো। যেখানে উৎপাদনের প্রয়োজনে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নারীর গুরুত্ব ছিল, সেখানে অনিবার্যভাবে নারীর আসনও ছিল সম্মানিত। অর্দ চৈলসের ভাষায়, 'নারীর মর্যাদা নির্ভর করে সমাজে তার অর্থনৈতিক ভূমিকার উপর।'[১১] এই মর্যাদা সামাজিক ক্ষেত্রে জননীকে পরিবারের কর্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করত এবং ধর্মাচারে মাতৃদেবী প্রাধান্য পেতেন।

দেবীপূজক কৃষিজীবীর সঙ্গে দেবপূজক আয়ুধজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। জীবনচর্চার ভিন্নমুখী প্রবাহের গভীরতা থেকে উৎসারিত এই বৈপরীত্য গুণগতভাবে আজকের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার চাইতে অনেকটা অন্য রকম। আধুনিক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বহু ক্ষেত্রে সমাজের উপরিকাঠামো থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি মানসিকতা যা সুকৌশলে সাধারণে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রাচীন যুগের ধর্মাচার ছিল মানুষের অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আরো অনেক প্রাসঙ্গিকভাবে বিজড়িত। কারণ, ধর্মাচারের যথাযথ অনুষ্ঠানের উপরই সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সার্থকতা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল—লোকায়ত সমাজ-মানসে এমন ধারণা দৃঢ়মূল ছিল। কৃষিজীবী সমাজে উর্বরতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন পুরুষ দেবতারা তাই বর্জনীয় বলে বিবেচিত হতেন। যেহেতু নারী-পুরোহিতদের মাধ্যমেই তাদের ধর্মাচারগুলো অনুষ্ঠিত হতো, অতএব সেই বর্জন-স্পৃহার বাস্তব প্রতি-রূপটি নারীসমাজের আচরণের মধ্যেই সত্য। যোদ্ধাদের দেবতা কার্তিক সম্পর্কে নারীসমাজের যে বিরাগভক্তি, তা এই প্রাথমিক প্রতিরোধেরই স্মারক। স্মারক আরো রয়েছে, যেগুলো আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আসবে।

দেখা যাচ্ছে, দুটো বিপরীতমুখী জীবনচর্চা থেকে উদ্ভূত ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে সংঘাত ছিল অনিবার্য। যে-কোনো সংঘাতেরই প্রাথমিক পর্যায়টা থাকে আপসহীন, প্রতিরোধের মুখে পড়ে কার্তিক-উপাসকদের আপসহীন প্রতিক্রিয়ার অবশেষ রয়ে গেছে কার্তিকের জন্মবৃত্তান্তে। মাতৃপ্রধান সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত থাকত, তার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু যে-কোনো সমাজেই মাতৃপরিচয় সর্বদা সুপ্রকট—এ নিয়ে দ্বিধা-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। কার্তিকের ক্ষেত্রে কিন্তু অধিকাংশ পৌরাণিক বিবরণেই সেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটি বর্ণিত হতে দেখি। পৌরাণিক কল্পনায় কার্তিক কখনও অগ্নির পুত্র, কখনও বা শিবের—কিন্তু তিনি শুধু মাতৃপরিচয়বিহীন নন, বস্তুত কার্তিকের জন্ম মাতৃগর্ভ থেকে

হয়নি, তিনি অযোনিসম্ভূত। পরবর্তীকালে অনেক দেবী কল্পনায়ও এই অযোনি-সম্ভূত মোটিফটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু মূলত এটা ছিল পুরুষ-প্রধান সমাজের নারীবর্জিত রূপকল্পনার চূড়ান্ত প্রকাশ। যে যুক্তিধারা এই ধরনের জন্মবৃত্তান্তের পিছনে কাজ করত, তার একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এফ. এম. হারসেন।[১৮] লাডাক অঞ্চলের একটি লোকবিশ্বাস উদ্ধৃত করে তিনি জানাচ্ছেন যে সেখানকার বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন গৌতম প্রথমে নারীগর্ভে আশ্রয় নিতেই রাজী ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি-বা রাজী হলেন, স্বাভাবিকভাবে ভূমিষ্ঠ হলেন না। তাঁর জন্ম হলো মহামায়ার বাহুমূল ভেদ করে। কেন? কারণ হিসাবে বলা হয় যে গৌতম নিজেকে যোনিদ্বারের অপবিত্রতা দিয়ে কলুষিত করতে চান নি। মাতৃগর্ভ সম্পর্কে এই অপবিত্রতার ধারণাটি প্রাচীন পিতৃ-প্রধান সমাজে আরো জোরালো-ভাবে বর্তমান ছিল। তাই আমাদের প্রধান পুরুষ-দেবতারা হয় স্বয়ম্ভূ, নতুবা অযোনিসম্ভূত : ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বরের মতো কার্তিক অত প্রাচীন দেবতা নন, কিন্তু তার জন্মবিবরণ অন্যান্য দেবতার চাইতেও বিস্তৃতভাবে সর্বত্র বর্ণিত। মনে হয় তার অযোনিসম্ভূত আবির্ভাবের সবিস্তার বিবরণের মধ্যে নারী-সংসর্গহীনতার উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। উল্লেখ্য যে কার্তিককে গর্ভে ধারণ করতে কোনো দেবীই যে সক্ষম নন, সে কথাও বারবারই তার জন্মবৃত্তান্তে ঘোষিত।

যৌধেয়দের কার্তিক পরবর্তী যুগে তার নারী বিদ্বেষ অনেকখানিই পরিহার করেছিলেন। খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী সময়ে তাদের মুদ্রায় কার্তিকের বিপরীতে একজন নারীদেবীকেও কখনও কখনও অঙ্কিত দেখা যায়। অনেকেই একে কার্তিকের স্ত্রী হিসাবে নির্দেশ করেছেন। যৌধেয়দের রাজনৈতিক বিস্তৃতির সময়েই এটা ঘটে-ছিল। পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে তখন তাদের যে সংযোগ ঘটেছে, তাই নয়, তাদের রাজনৈতিক সীমাও তখন বিস্তৃত হচ্ছিল। একটা সময়ে মথুরা পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল।[১৯] মথুরায় মাতৃগোত্রধারী অভিজাত শ্রেণীর ব্যাপক অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে।[১০] প্রতিবেশী মদ্র এবং বাহীকদের মধ্যে যে মাতৃপ্রাধান্য ছিল তা আগে উল্লেখ করেছি। আরেকটি প্রতিবেশী গোষ্ঠী শাকম্ভরী অস্ট্রিক এবং কৃষিজীবী ছিল বলে সুধাকর চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন।[১১] বোঝা যায় রাজনৈতিক সম্প্রসারণকে সংরক্ষণ করার মানসে সমন্বয়ের প্রয়োজন যৌধেয়রা উপলব্ধি করেছিল। মুদ্রায় স্ত্রী দেবতার আরোপণ ছাড়াও এই প্রয়াসের পরোক্ষ আরেকটি সাক্ষ্য রয়েছে, প্রায় সমস্ত পৌরাণিক কাহিনীই একমত যে কার্তিককে

স্তন্যদান করেছিলেন ছয়জন কৃত্তিকা।[২১] কোশাম্বীর মতে এই কৃত্তিকারা মাতৃকা দেবী ভিন্ন অন্য কিছু নন, এবং মাতৃপ্রধান ধর্মাচারগুলোকে পুরুষ দেবতার নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যই ছ-জন স্তন্যদায়িনীর সঙ্গে কার্তিককে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল।[২২] বশ্যতামূলক মিত্রতা স্থাপনের এই ধর্মীয় প্রয়াসের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিরূপণ দুরূহ নয়।

৫

যৌধেয়রা কার্তিক দেবতার আদি উপাসক এবং কার্তিক পরিকল্পনার আদি রূপকার ছিল বটে, কিন্তু কার্তিক উপাসনার প্রচার এবং প্রসারের দায়িত্ব দীর্ঘদিন তাদের বহন করতে হয়নি, আরো ক্ষমতাবান প্রভাবশালী কিছু গোষ্ঠী নিজ প্রয়োজনেই সে-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদই গঙ্গা-যমুনার অববাহিকায় লাঙলভিত্তিক কৃষির ব্যাপক বিস্তার ঘটে,[২৩] তার অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যক্তিগত মালিকানার জন্ম হয় এবং পিতৃপ্রধান সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। নবোত্থিত এই সামাজিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় কার্তিকের নারীদ্বেষী রূপকল্পনাটি খুবই উপযোগী ছিল।

নতুন অর্থনীতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় সামাজিক আদর্শেরই শুধু পরিবর্তন ঘটায়নি নতুন রাজনীতিরও জন্ম দিয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান সেই নতুন রাজনীতিরই ফসল। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি শুঙ্গ রাজবংশের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর মহাভাষ্যে পাই যে মৌর্যদের সময়ে রাজকীয় উদ্যোগে স্কন্দ ও বিশাখের মূর্তি তৈরি করে তা সাধারণ্যে বিক্রি করা হতো।[২৪] বণিকবৃত্তি তখন সম্মানজনক পেশা, তাই বাণিজ্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও নীতিসম্মত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সরাসরিই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রজাদের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে রাজারা অর্থ সংগ্রহ করবেন।[২৫] মহাভাষ্যের এই তথ্যটি থেকে বোঝা যায় যে, স্কন্দ-বিশাখ মৌর্য-যুগের জনপ্রিয় দেবতা, নইলে এদের মূর্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের প্রশ্ন উঠত না। দ্বিতীয়ত, মৌর্যরা ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে যাই হোন-না কেন, কার্তিক উপাসনার প্রসারে তাদের সম্মতি ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পাঞ্জাব এবং সন্নিহিত অঞ্চলকে স্বীয় রাজ্যান্তর্গত করেছিলেন, তখন যৌধেয়দের সংস্পর্শে কার্তিক উপাসনার সঙ্গে মৌর্যদের পরিচয় ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু পরিচয়ের সূত্রেই কার্তিক মৌর্যদের আনুকূল্য লাভ করেননি। এর পেছনে আরেকটু গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য নিহিত ছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ের রাষ্ট্র সংগঠনগুলো সৈন্য সংগ্রহ করত ট্রাইবেল বন্ধনের সূত্র ধরে, বেতনভোগী সৈন্যের ধারণা তখন অস্পষ্ট ছিল।[২৬] কিন্তু কোসাম্বী দেখিয়েছেন যে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধে পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র জনপদগুলি অনেক ক্ষেত্রে বেতন-ভোগী সৈন্য নিয়োজিত করেছিল। খুবই সম্ভাব্য যে আয়ুধজীবী বলে পরিচিত জনগোষ্ঠীসমূহ এই সৈন্য সরবরাহে একটা ভূমিকা পালন করত। অর্থাৎ কার্তিক উপাসনার উৎসভূমির সঙ্গে প্রাচীনতম বেতনভোগী সৈন্য সংগ্রহের পটভূমির একটা সম্পর্ক ছিল। নন্দদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল এবং তাতে বেতনভোগী সৈন্য নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু সৈন্যবাহিনীকে একটা সুশৃঙ্খল সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রের একটা স্থায়ী অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত করার কৃতিত্ব নিশ্চিতই মৌর্যদের প্রাপ্য। সেনাপতির স্বতন্ত্র দায়িত্ব এবং মর্যাদার ধারণাটিও মৌর্যযুগেরই সৃষ্টি।

দেবসেনাপতি কার্তিক এই বেতনভোগী সৈন্য সংগ্রহের আদর্শগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুবই উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। কার্তিক চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা মহাভারতে রয়েছে, যার উল্লেখ করলে এই উপযোগি-তার স্বরূপটি পরিষ্কার হবে। কার্তিক দেবসেনাপতি বটে, কিন্তু শত্রু নিধনেই তাঁর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ, তিনি কদাচ রাজপদ-প্রত্যাশী নন। মহাভারতের বনপর্বে রয়েছে যে একবার ইন্দ্র কার্তিককে দেবরাজের পদ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে-ছিলেন। কার্তিকের জবাবটি লক্ষণীয়: 'আমি দেবরাজের কিঙ্করত্বের অভিলাষী, ইন্দ্রত্ব আমার অভীপ্সিত নয়।' রাজপদ সম্পর্কে এই অনীহা যৌধেয়দের মানসিকতা থেকেও সঞ্চারিত হতে পারে। রাজতন্ত্র যৌধেয়দের রাষ্ট্রাদর্শের পরিপন্থী ছিল, প্রায় সহস্র বৎসরের রাজনৈতিক অস্তিত্বের মধ্যে বরাবরই তারা ট্রাইবেল গণরাষ্ট্রের কাঠামোটি বজায় রেখেছিল। যাই হোক, পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবেশে কার্তিকের রাজপদ-সংক্রান্ত এই মনোভাব রাজনীতি-নিরপেক্ষ বেতনভোগী সৈন্যদল গঠনের আদর্শগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে লেগেছিল।

মৌর্যদের পরেই কতকগুলি বহিরাগত জাতি ভারতের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। কুষাণরাজ হুবিষ্ক কার্তিক এবং ময়ূরাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করেছিলেন। তৃতীয় শতকের শকক্ষত্রপ জীবদাম কার্তিকভক্ত ছিলেন, এমন লিপি-প্রমাণ রয়েছে। গোস্থর শকর নামক আরেক বিদেশী সামন্ত কার্তিকের একটি মন্দির ঐ সময়ে তৈরি করেছিলেন। বিদেশী শাসকশ্রেণীর মধ্যে কার্তিক উপাসনার এই জনপ্রিয়তার একটা কারণ এই হতে পারে যে এদের বেতনভোগী সৈন্যদলের উপর নির্ভরশীলতা ছিল বেশি। আবার সাধারণ ক্ষত্রিয় সহোদররা মিলে কার্তিকের

মূর্তি প্রতিষ্ঠা করছেন এমন প্রমাণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই আমরা পাচ্ছি।[২৭] গুপ্ত-যুগের আগেই যে কার্তিক ক্ষত্রিয় আদর্শের প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন, তার প্রমাণ আমরা পাই অযোধ্যার দেবমিত্র এবং বিজয়মিত্রের মুদ্রায়, মেহরাপুরের একটি স্তম্ভে, কুমার বীরদত্তের প্রস্তরলিপিতে এবং রাজা সর্বনাথের তাম্রলিপিতে।[২৮]

কার্তিক উপাসনা জনপ্রিয়তার তুঙ্গশিখরে পৌঁছায় গুপ্তযুগে। কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত নামদুটি সে-জনপ্রিয়তার দ্যোতক। এদের মুদ্রায়ও কার্তিক উপাসনার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।[২৯] সর্বোপরি এ যুগেই রচিত হয় কুমারসম্ভব—কার্তিক-উপাসনাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস হিসাবে যার মূল্য সর্বাধিক। মনে হয় এ যুগে কার্তিক-উপাসনার সঙ্গে একটা নতুন মাত্রাও যুক্ত হয়েছিল। হুন আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ভারতীয় শাসকশ্রেণী কার্তিকের অসুরনিধনের কাহিনীকে নিজস্ব প্রতিরোধ-প্রয়াসের আদর্শগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে চেয়েছিল। ভি. এস. আগরওয়ালার উক্তি : 'প্রকৃতপক্ষে গুপ্তযুগে স্কন্দ পরিণত হয়েছিলেন জাতীয় আদর্শের প্রতীকরূপী দেবতায়।'[৩০]

গুপ্তযুগের পর থেকেই কার্তিকের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে এবং কালক্রমে স্বতন্ত্র দেবতা হিসাবে তার গুরুত্ব ম্লান হয়ে যায়।

৬

রাজনৈতিক ইতিহাসের এই তথ্যগুলো থেকে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারতবর্ষে ট্রাইবেল সমাজ ভেঙে রাজতন্ত্রের উদ্ভব এবং বিকাশের সঙ্গে কার্তিক উপাসনার বিস্তৃতির একটা সম্পর্ক বর্তমান। মৌর্যযুগ থেকে গুপ্তযুগ, এই ছিল কার্তিক-প্রভাবের কাল-সীমা। উত্তর-ভারত কেন্দ্রিক রাজতন্ত্রের স্বর্ণযুগও মোটামুটি এই কালসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। এদেশের প্রথম সংগঠিত সাম্রাজ্য কার্তিককে পাদপ্রদীপের সামনে এনে-ছিল এবং শেষ সংগঠিত সাম্রাজ্য তাকে তুলে ধরেছিল। কোসাম্বী দেখিয়েছেন যে বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্যদলের উপর যে গুরুত্ব মৌর্যযুগে দেওয়া হতো, গুপ্তযুগ পর্যন্ত তার একটা ধারাবাহিকতা ক্রমক্ষীয়মানভাবে বর্তমান ছিল। গুপ্ত যুগের পরে বস্তুত এই ধরনের সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্বই দুর্লক্ষ্য হয়ে পড়ে[৩১], বহুধাবিভক্ত দেশের কৃষিনির্ভর সামন্তবাদী অর্থনীতি স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর দায় বহনে আর সক্ষম ছিল না। পরিবর্তিত আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কার্তিকের প্রাসঙ্গিকতাও কমে এল। হর্ষবর্ধনের স্বল্পজীবী সাম্রাজ্য সে-প্রাসঙ্গিকতার পুনরুদ্ধারে সক্ষম ছিল না।

রাজনৈতিক উত্থানপতনের সঙ্গে কার্তিকের গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধির এই যোগাযোগ থেকেও বোঝা যায় যে কার্তিক ছিলেন শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত দেবতা। প্রশ্ন উঠবে, শাসকশ্রেণীর বাইরে পরিব্যাপ্ত যে লোকায়ত সমাজ, তার সঙ্গে কার্তিকের সম্পর্কটা কী ছিল? আমরা দেখিয়েছি যে পিতৃপ্রধান ট্রাইবাল সমাজ থেকেই এদেশের যোদ্ধাশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং কার্যত এদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শাসকশ্রেণীর ধর্মীয় আদর্শ গৃহীত হয়েছিল। অপর দিকে প্রজাসাধারণের জীবিকার প্রাথমিক ভিত্তি ছিল কৃষি এবং পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কাঠামোতেও মাতৃপ্রধান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মধ্যে বহুলাংশে বজায় ছিল। অতএব সংঘাত একটা রইল। উচ্চকোটির সমাজের প্রয়াস সত্ত্বেও কার্তিক তাই লোকায়ত সমাজের কাছে পরিপূর্ণ গ্রহণীয় বিবেচিত হলেন না, বরঞ্চ একটা প্রতিরোধের প্রয়াস বরাবরই বহমান থেকে গেল। সে-প্রয়াসের অন্তর্নিহিত শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি, যখন দেখি উচ্চকোটির সমাজের সাহিত্যেও কার্তিক সম্পর্কে এক ধরনের বিরূপতা মাঝে-মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

'ব্রহ্মচারী', 'যোগীশ্বর' ইত্যাদি অভিধার প্রয়োগে কার্তিককে যতই গরীয়ান করা হোক-না কেন, মাঝে-মধ্যে তার চরিত্রে বিচিত্র সমস্ত বৈপরীত্য সন্নিবেশিত হতে দেখি। যেমন ব্রহ্মপুরাণে যোগীশ্বর এই দেবতা কামুক এবং লম্পট হিসাবে চিত্রিত। বিবরণটি সংক্ষেপে এইরূপ, একটা সময়ে কার্তিক দেবপত্নীদের সঙ্গে যথেচ্ছ কামক্রীড়ায় লিপ্ত থাকতেন। বিপন্ন দেবতারা দেবী দুর্গার কাছে নালিশ জানালেন। দেবী পুত্রকে বারণ করলেন কিন্তু তা কাজে লাগল না। অনেক চিন্তা করে তিনি একটি কৌশল আবিষ্কার করলেন। তিনি নিজেকে বহুরূপে বিভক্ত করে সমস্ত দেবপত্নীতে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিলেন। ফলে কার্তিকেয় যখনই যে দেবপত্নীকে কামক্রীড়ায় তার সঙ্গী হতে আহ্বান জানান, তাকেই তার মায়ের মূর্তিতে দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যান। এ ভাবে সমস্ত স্ত্রী জাতিকে তার মা বলে মনে হয়, তখন তার বৈরাগ্য জন্মায়।'[৩১]

সুরমা-বরাক উপত্যকার নারীসমাজের মধ্যে একটি মৌখিক কাহিনী প্রচলিত। কাহিনীটি সমজাতীয়, কিন্তু আরো গুরুতর। সেই কাহিনী অনুসারে কার্তিক মাতৃরূপ দর্শনে কামমুগ্ধ হয়ে তাকে সম্ভোগ করেছিলেন এবং সেই অপরাধে তিনি এবং তার বাহন ময়ূর উভয়েই কামক্রীড়ার ব্যাপারে শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন। পিতা-কর্তৃক কন্যাকে সম্ভোগের কাহিনী পৌরাণিক সাহিত্যে একাধিক রয়েছে, কিন্তু মাতৃ-সম্ভোগের incest motif এদেশীয় লিখিত সাহিত্য বা লোকশ্রুতিতে আর

পাইনি। অনুমান করা যায় যে লোকশ্রুতিতে ধৃত এই কাহিনীর উপাদানই প্রাচীনতর এবং ব্রহ্মপুরাণের কাহিনীটি তারই পরিশীলিত রূপমাত্র। মাতৃপ্রধান সমাজে মাতৃগমন একটা অবিবাহ্য পর্যায়ের অপরাধ এবং কার্তিকের উপর সে-ধরনের অপরাধ আরোপ করার মধ্যে সেই ধরনের সমাজের তীব্র বিরূপতাই আমরা প্রত্যক্ষ করি।

উল্লেখযোগ্য যে কার্তিকের এই ব্যভিচারী রূপের উল্লেখ স্কন্দপুরাণের প্রভাস-খণ্ডের মধ্যেও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পতিতারা যে কার্তিকপূজা করেন এবং সেই-সঙ্গে অ্যাডোনিস গার্ডেন তৈরি করে তাকে কার্তিকপূজার অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেন, তার সঙ্গেও কার্তিকের এই ব্যভিচারী রূপটির সম্পর্ক রয়েছে। এটা স্বীকৃত যে প্রাচীন মাতৃপ্রধান সমাজের নারী-পুরোহিতরা পুরুষপ্রধান সমাজে গণিকায় পরিণত হয়েছিলেন।[১৩] সামাজিক পালাবদলের এই মূল্য দেবদাসীরা এখনও দিয়ে চলেছেন। কার্তিক-আরাধনার সঙ্গে পতিতাদের সংস্রব পুরুষশাসিত সমাজের নিকট নারী-পুরোহিতদের সেই আত্মসমর্পণেরই স্মারক—আরোপিত মূল্যবোধের প্রবহমান চাপে তাদের চেতনায় আজ নাগর হিসাবে কার্তিকই চূড়ান্ত কামনার ধনে পরিণত। বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা ব্যতীত যে দুর্গাপূজা হয় না, তার মধ্যেও নারী-পুরোহিতের এই শোচনীয় রূপান্তরের বার্তাটি নিহিত। আর অ্যাডোনিস গার্ডেন সৃষ্টি করে পতিতারা কৃষিজীবী সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট আদিম সেই গৌরবময় পুরোহিত-বৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতেরই অনুবর্তন করেন মাত্র।

শুধু ব্যভিচারী নয়, কোথাও কোথাও কার্তিক আবার বর্ণিত হয়েছেন গর্ভস্থ এবং অল্পবয়স্ক শিশুদের অনিষ্টকারী রূপে। যেমন পারস্কর গৃহ্যসূত্রে কার্তিককে শিশুদের উপর উপদ্রবকারী অসুর বলা হয়েছে। অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক গ্রন্থের একটি প্রসঙ্গেও স্কন্দ এবং বিশাখ শিশুনাশকারী দুর্গ্রহ হিসাবে চিহ্নিত। বায়ুপুরাণে কার্তিকের অনুচর স্কন্দগ্রহরা রাক্ষস এবং শিশুদের পক্ষে ভীতিপ্রদ বলে অভিহিত। তবে কার্তিকের এই রূপটি সবচাইতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে মহাভারতের বনপর্ব ও শল্যপর্বে। ঐ বর্ণনা অনুসারে কার্তিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সৃষ্ট স্কন্দগ্রহ এবং কুমার-কুমারীরা গর্ভস্থ সন্তাননাশ ও বালকদের অনিষ্ট সাধনে সতত তৎপর থাকে।

কার্তিক চরিত্রের এই উপাদানটিও কৃষিজীবী সমাজের প্রতিক্রিয়ার সূত্রেই লভ্য। আদিম কৃষিজীবীর কাছে যেহেতু জমির উর্বরতা এবং নারীর সন্তানধারণ ক্ষমতা একই অবিচ্ছেদ্য গুণের প্রকাশ, অতএব যোদ্ধাদের কৃষিবিরোধী নারীদেবী

দেবতা তাদের কাছে সামগ্রিকভাবেই উর্বরতার পরিপন্থী শক্র হিসাবে চিহ্নিত। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সন্তান-কামনায় কার্তিক পূজার রীতি কোথাও কোথাও প্রচলিত এবং সেই সূত্রে কেউ কেউ কার্তিককে উর্বরতার দেবতারূপে গণ্য করতে আগ্রহী। এই সরলীকরণের মধ্যে যে সত্যটি উপেক্ষা করা হয় তা হলো এই যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কার্তিক পূজিত হন মূলত উর্বরতার পরিপন্থী শক্তি বা **malignant deity** হিসাবে, তার অনিষ্টকর শক্তিকে লাঘব করার জন্য। ভক্তি নয়, ভয়ই এই ধরনের পূজার উৎস। তাই কৃষিজীবী সমাজের দেবীরা যে অর্থে উর্বরতার প্রতীক, কার্তিকের অবস্থান তার ঠিক বিপরীত মেরুতে।

কার্তিকের সহযোগী হিসাবে মহাভারতে আমরা অনেক মাতৃকাদেবীর নাম পাই, কার্তিকের শিশুবেষী চরিত্রলক্ষণ কিন্তু এদের উপরও আরোপিত। মাতৃকাদের স্বাভাবিক আচরণ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না, কারণ এরা মূলত বিভিন্ন কৃষিজীবী সমাজের লৌকিক দেবী। অস্বাভাবিক এবং বিপরীত চরিত্রলক্ষণ এই-সমস্ত মাতৃকাদের উপর কেমন করে আরোপিত হলো, বনপর্বের উপাখ্যানের মধ্যেই তার সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়। বর্ণনা রয়েছে যে এই সমস্ত 'লোকমাতা' প্রথমে কার্তিকের বিনাশের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা সে দায়িত্ব পালন না করে কার্তিকের সহযোগীতে পরিণত হয়েছিলেন। বোঝা দুষ্কর নয় যে কৃষিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা প্রাথমিক সংঘাতের পর কার্তিককে গ্রহণ করেছিলেন, এই সমস্ত লোকমাতা তাঁদেরই দেবী। সংঘাতের তীব্রতাকে যাঁরা শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন, আত্মসমর্পণকারী এই সমস্ত গোষ্ঠীর দেবীকে তাঁরা কার্তিকের সমপর্যায়েই ঠেলে দিয়েছিলেন। কার্তিকের সৌজন্যে এই সমস্ত সমাজে যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল, তার নিদর্শনও মহাভারতেই বর্তমান। যেমন, কার্তিক-অনুসারী মাতৃকারা কার্তিকের কাছে প্রার্থনা করছেন, 'ব্রাহ্মী মহেশ্বরী প্রভৃতি যাহারা পূর্বে মাতৃপদে পরিকল্পিত হইয়াছে, এখন তাহাদের যেন সেই পদ না থাকে, কেহ যেন তাহাদের পূজা না করে।··· আমরা তোমার সহিত মিলিত হইয়া সেই সমুদয় মাতৃগণের প্রজা ও পিত্রাদিকে ভক্ষণ করিতে বাসনা করি।'[৩৪] বলবান বহিঃশত্রুর সঙ্গে আনুগত্যমূলক মিত্রতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জয়ী হওয়ার এই কামনা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, এর অন্যতর কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

৭

মুরমা-মরাক উপত্যকায় আচরিত একটি বেঙেলি ধর্মাচার এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি প্রকৃতিনির্ভর উপাখ্যানকে নিয়ে আমাদের এই আলোচনা শুরু হয়েছিল। কার্তিক-উপাসনার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের সর্বভারতীয় যে পটভূমি আমরা নির্মাণ করতে প্রয়াসী, ধর্মাচার এবং উপাখ্যানটি তাকে আরেকটু স্পষ্ট করে। চুঁচুড়ার পণ্ডিতরাও নকল শস্যক্ষেত্রকে কার্তিকপূজার অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেন, কিন্তু কোনো কার্যকারণ সম্পর্কের সূত্রে সে অনুষঙ্গ গ্রথিত নয়। এখানকার অনুষ্ঠানটি একেবারে পরিপ্রেক্ষিতভ্রষ্ট নয়, বধূরূপী উষার অনুপ্রবেশ শস্যক্ষেত্রটিকে মূল তাৎপর্যে মণ্ডিত করে এবং তার পরও যেটুকু অবোধ্য থাকে, উপাখ্যানটি তার উপর আলোকপাত করে।

উষা এখানে নিশ্চিতই শস্যপ্রাণের নারী প্রতিরূপ। ফ্রেজার জানাচ্ছেন যে শস্যপ্রাণের প্রতীক রূপে শস্যকুমারীর ধারণা আদিম কৃষিজীবী সমাজের অনেকগুলিতেই প্রচলিত ছিল।[৩৫] বিস্তর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলছেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শস্যকুমারীদের বধূবেশে সজ্জিত করা হতো। ন্যাকড়া বা কাদামাটি দিয়ে শস্যকুমারী নির্মাণের প্রথা অন্যত্রও ছিল। এই শস্যকুমারীরাই শস্যদেবী এবং মাতৃকাদেবীতে পরিণত হতেন একটা পর্যায়ে।[৩৬]

উপাখ্যানটি যে তার আদিরূপে এ যুগের নারীদের কাছে বর্তায়নি, সে তো নিশ্চিত। পরবর্তী পরিশীলনের ছাপ তার সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট। কিন্তু উষার লুক্কায়িত জীবনযাপন এবং অভীষ্ট বিবাহ দুটি প্রাচীন মোটিফের সাক্ষ্য বহন করে। উষা লুকিয়ে থাকেন শস্যক্ষেত্রে, অর্থাৎ শস্যদেবীর নিজস্ব বিচরণভূমিতে। পলাতকা উষার এই রূপটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় গ্রীক পুরাণের মিথগুলিকে, দেবতারা বা তার প্রতিভূ রাজারা যেখানে দেবীদের তাড়া করে বেড়াচ্ছেন আর দেবীরা পালিয়ে যাচ্ছেন। রবার্ট গ্রেভস বলেছেন যে মাতৃপ্রধান সমাজের উপর পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়াতেই গ্রীক মিথগুলি এই আকার নিয়েছে।[৩৭] আর কোসাম্বী দেখিয়েছেন যে আরেকজন মাতৃদেবী, ঋগ্বেদের উষা এমনভাবে পিতৃপ্রধান আর্যসমাজের দেবতা ইন্দ্র কর্তৃক বিধ্বস্ত, শেষ পর্যন্ত তিনি পালিয়ে যান দূরান্তরে।[৩৮]

অভীষ্ট বিবাহের মোটিফটি সাক্ষ্য দেয় যে কোনো একটা সময়ে কৃষিজীবী গোষ্ঠীর শস্যদেবী উষাকে কার্তিকের স্ত্রী-রূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল। অর্থাৎ উচ্চকোটির সমাজ নিজেদের ধর্মাদর্শ চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কৃষিজীবীদের উপর। কিন্তু সে

প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। কার্তিকের অভিসার যে ব্যাপারটা উপাখ্যানে ঢুকেছে, তা পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে সংযোজিত, লুকায়িতা উষাকে খুঁজে না পাওয়ার মধ্যেই মূল সত্যটি নিহিত। অর্থাৎ দেবসেনাপতি কার্তিক এখানে ব্যর্থ অভিসারের নায়ক, তার আগ্রাসন প্রয়াস এখানে প্রতিহত। সুরমা-বরাক উপত্যকার মেয়েরা তাই কার্তিকের কাছে মাথা নোয়ায় না। এই মানসিকতা যে এককালে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত ছিল, তারই সাক্ষ্য আমরা খুঁজে পাই বিক্রমোর্বশীতে, কথাসরিৎসাগরে কিংবা শিবলীলামৃতে। আর একই মনোভাবের অবশেষ রয়ে গেছে মহারাষ্ট্র এবং মহীশূরের নারীসমাজের আচরণের মধ্যে। অর্থাৎ অসমাপ্ত একটি সংঘাতের ধ্বজা কোনো কোনো অঞ্চলের নারীসমাজ এখনও বয়ে চলেছেন। উষা-সংক্রান্ত ধর্মাচার এবং উপাখ্যান সেই সংঘাতের কার্যকরণ-সমন্বিত পরিপ্রেক্ষিতের উপর আলোকসম্পাত করে।

যোদ্ধারা পরাক্রান্ত, প্রত্যক্ষ সংঘাতে তাদের জয় অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু পরাজিত দুর্বলেরও প্রতিরোধের নিজস্ব প্রক্রিয়া থাকে, অন্তর্লীন সেই প্রক্রিয়া দৃষ্টির অন্তরালে সমাজের অভ্যন্তরে কাজ করে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে দেখি ভবানী বা কালিকাই এ দেশীয় যোদ্ধ সমাজের অধিষ্ঠাত্রীতে পরিণত, নারী দেবীদের এই পুনর্বাসন, তাও যোদ্ধ সমাজে, সেই প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার সাফল্যের দ্যোতক। দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে লোকায়ত সমাজ-মানস যে আরোপিত মূল্যবোধকে পরাজিত করতে সক্ষম, দেবসেনাপতি কার্তিকের ধারাবাহিক অবমূল্যায়ন তারই নিদর্শন।

১৯৮৭

নির্দেশপঞ্জি ও টীকা

১. J. G. Frazer, *The Golden Bough*, pp. 449-57

২. N. N. Bhattacharyya, *History of Indian Erotic Literature*, p. 93

৩. Frazer, *Ibid*, p. 520

৪. D. D. Kosambi, *Myth and Reality*, p. 190 ; *The Culture and Civilization of Ancient India*, pp. 116, 170

৫. Kosambi, *Myth and Reality*, p. 90

৬. A. K. Chatterjee, *The Cult of Skanda Kartikeya in Ancient India*, pp. 102-03
৭. Kosambi, *Myth and Reality*, p. 90
৮. A. K. Chatterjee, *Ibid*, pp. 102-03
৯. *Ibid*
১০. *Ibid*, pp. 37-39
১১. Sudhakar Chattopadhyay, *Racial Affinities of Early North Indian Tribes*, p. 86
১২. A. K. Chatterjee, *Ibid*, p. 36
১৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'লোকায়ত দর্শন', পৃ ২৯৯-৩০৭
১৪. Frazer, *The G. B.*, p. 279
১৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ২২৪-২৬
১৬. Robert Brifault, *The Mothers*, Vol III, p. 24
১৭. George Thompson, *Religion*, p. 10
১৮. F. N. Harsen, *Buddhist Kashmir*, p. 3
১৯. B. C. Laha, *Historical Geography of Ancient India*, p. 109
২০. D. C. Sircar (ed.) *Social Life in Ancient India*, p. 72
২১. S. Chattopadhyay, *Ibid*, pp. 85-86
২২. Kosambi, *Myth and Reality*, p. 80
২৩. Kosambi, *The Culture and Civilization of Ancient India*, pp. 100-101
২৪. A. K. Chatterjee, *Ibid*, pp. 29-31
২৫. R. S. Sharma, *Perspective of Social and Economic History of Early India*, p. 70
২৬. Kosambi, *The Culture and Civilization of Ancient India*, p. 135
২৭. A. K. Chattejee, *Ibid*, pp. 40-45
২৮. *Ibid*
২৯. *Ibid*, pp. 42-43

৩০. V. S. Agarwal, *Journal of Uttar Pradesh Historical Society*, Vol. IX, p. 32
৩১. Kosambi, *The Culture and Civilization of Ancient India*, pp. 190-91
৩২. 'ব্রহ্মপুরাণ', অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী অনূদিত, পৃ. ১৫৬
৩৩. Kosambi, *Myth and Reality*, p. 81
৩৪. 'মহাভারত', বনপর্ব, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত
৩৫. Frazer, *Ibid*, pp. 535-42
৩৬. 'উষা' নামটির উৎস সম্পর্কে আমরা স্থির নিশ্চয় হতে পারিনি। বৈদিক উষাও কোনো কোনো স্তোত্রে শস্যদেবী এবং ইন্দ্র কর্তৃক লাঞ্ছিতা। কোসাম্বি উষাকে প্রাগার্য হরাপ্পা যুগের মাতৃকাদেবী রূপে চিহ্নিত করেছেন। সুরমা-বরাক উপত্যকার লোকায়ত শস্যদেবী উষাকে বৈদিক উষার সঙ্গে অভিন্ন বলে নির্দেশ করতে আগ্রহ বোধ করা স্বাভাবিক। কিন্তু সরাসরি প্রমাণের অভাবে এ ধরনের অভিন্নতা যুক্তিগ্রাহ্য রূপে প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ।
৩৭. R. Graves, *Greek Myths*, Vol. 1, p. 126
৩৮. Kosambi, *Myth and Reality*, pp. 65-66

বৃহন্নলা : উৎস এবং পটভূমি

মহাভারতের গল্পাংশের একটা মৌল কাঠামো রয়েছে, কুরুবংশের উত্থান-পতন তার উপজীব্য। কিন্তু ঐ কাঠামোর ভেতরে এবং বাইরে এমন কিছু কিছু তথ্য ও ঘটনা সন্নিবেশিত, যেগুলিকে আরোপিত বলে চিহ্নিত করা সম্ভব। মূল কাহিনীর সঙ্গে কার্যকারণের অনিবার্যসূত্রে এগুলি আবদ্ধ নয়। নান্দনিক বিচারে এই প্রক্ষেপগুলি কাহিনীর দোষাবহরূপ, কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এগুলির মূল্য সমধিক। গ্রহণ-বর্জন-সংশোধন-সংস্কারের অবিরাম প্রক্রিয়ায় বহুযুগ ধরে যে গ্রন্থটি বহুজনের অংশগ্রহণে বিরচিত, সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্মারক তাতে টিঁকে থাকবেই। আরোপিত ঐ অংশগুলি সেই সমস্ত স্মারকেরই বাহকবাহী।

অজ্ঞাতবাসের সময়ে অর্জুন পরিণত হয়েছিলেন নপুংসকে। বিরাটরাজার অন্তঃপুরে রাজকন্যার নৃত্যশিক্ষকরূপে বর্ষকাল তিনি যাপন করেছিলেন। মনে হয় এই বৃহন্নলা-পর্বটিও তেমনই একটি স্মারক। নিশ্চয়ই শুধুমাত্র অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজনে এমনটি ঘটেনি, কারণ দ্রৌপদী এবং অন্য পাণ্ডবরা তো নিতান্ত অনায়াসেই ঐ পর্যায়টি অতিক্রম করেছিলেন। কাহিনীতেও রয়েছে যে অর্জুনের নপুংসকত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল পূর্বেকার একটি অভিশাপ, অজ্ঞাতবাসের সময়ে অর্জুন সেই অভিশাপটিকে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। বিচার করলে দেখা যাবে, উর্বশীর অভিসার, অর্জুনের প্রত্যাখ্যান, উর্বশীর শাপপ্রদান, অর্জুনের নৃত্যগীত শিক্ষা এবং তার নপুংসকত্বপ্রাপ্তি—এগুলি মোটামুটিভাবে কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ, অর্থাৎ এই তথ্যগুলির মধ্যে একটা স্বতন্ত্র উপকাহিনীর আদল পাওয়া যায়।

কিন্তু ঐটুকুই। এই উপকাহিনীর পূর্বাপর নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যে অবশেষটুকু টিঁকে রয়েছে, তারও একটা দাবি রয়েছে। সুদূর অতীতে, সামাজিক বিবর্তনের কোনো একটা পর্যায়ে, অজ্ঞাত কোনো নরগোষ্ঠী তাদের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আবছা ইঙ্গিতটুকু লিপিবদ্ধ করে গেছে, উত্তরপুরুষদের দায়িত্ব তার পাঠোদ্ধার করা। প্রাপ্ত তথ্যগুলি খণ্ডিত, সাধারণে ইতিহাস নীরব, অন্য উপাদান দুর্লভ, এমন অবস্থায় দায়িত্বের বোঝাটা নিশ্চয়ই দুর্বহ। বস্তুত আমাদের দেশের ইতিহাসচর্চার বর্তমান স্তরে বৃহন্নলা-উপাখ্যানের পূর্ণ তাৎপর্য নিরূপণ বোধহয় অসম্ভবই। সম্ভব শুধু অনুসন্ধানের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত-

করণের প্রয়াস চালাবো, যে প্রয়াস অব্যাহত থাকলে কোনোদিন হয়তো-বা পূর্ণ পটভূমির পরিচয়ও পাওয়া যাবে।

২

পাথুরে বা লিখিত ইতিহাস যেখানে কোনো সাক্ষ্য দিচ্ছে না, সেখানে লোকায়ত জীবনের চলমান ইতিহাস হাতড়ে বেড়ানো ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। প্রারম্ভিক ভিত্তি হিসেবে সেখান থেকে সংগ্রহকৃত একটি তথ্যকেই আমরা কাজে লাগাচ্ছি। উল্লেখযোগ্য যে এদেশের লোকনৃত্যের একটি বিশেষ ধারা আজও বৃহন্নলাকে আদিগুরুর মর্যাদা দিয়ে থাকে। ওজাপালি উত্তর-পশ্চিম আসামের একটি সুপ্রাচীন এবং জনপ্রিয় লোকনৃত্য। এই নাচটির দুটি ধারা, সুকন্নানি এবং বিয়া ওজাপালি। সুকন্নানি ধারাটিই সুপ্রাচীন, বিয়া ওজাপালি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের প্রভাবে সংস্কৃত। সুকন্নানি ওজাপালির শিল্পীরা বিশ্বাস করেন যে বৃহন্নলা স্বর্গ থেকে এই নাচটি শিখে এসেছিলেন, তিনি শেখান উত্তরাকে, অতঃপর এই নৃত্যপদ্ধতি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

'ওজাপালি' সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান, ওজা দলের নায়ক, পালি বলতে তার সহযোগীদের বোঝায়। কিন্তু সুকন্নানির মূল আকর্ষণ হচ্ছে 'দেওধনী' নাচ। প্রতি দলে একজন নর্তকী থাকে, তাকে বলা হয় দেওধনী। সামাজিক কাঠামোর নীচের তলা থেকে অথবা সমতলীয় জনজাতির মধ্য থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়। মৃদঙ্গ, ঢোল এবং করতালের তালে তালে দেওধনী নাচে, শেষ পর্যায়ে এলায়িত কুন্তলা দেওধনীর দ্রুত পদচালনা এবং আবর্তন দর্শকদের মধ্যে বিচিত্র উন্মাদনার সৃষ্টি করে। অতুলচন্দ্র বরুয়ার ভাষায় : 'সুকন্নানি ওজাপালির বাড়তি আকর্ষণ দেওধনী (আক্ষরিক অর্থে দেব-নারী) নৃত্য। এই নাচের সব থেকে মনোরম অংশ সামনে পিছনে গতিময়তায় বৃত্তাকার ঘূর্ণাকে নর্তকীর সুদীর্ঘ কেশরাশির বলিষ্ঠ আলোড়ন।'[২]

সুকন্নানি ওজাপালি অনুষ্ঠানভিত্তিক নৃত্য। সাধারণত মনসাপূজার সময়েই এর আয়োজন হয়। 'সুকন্নানি' কথাটিই এসেছে সুকবি নারায়ণদেব থেকে। নারায়ণদেব শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ এবং উত্তর-পশ্চিম আসামের সর্বাধিক জনপ্রিয় মনসামঙ্গলের কবি, সাধারণত তাঁর গানের সঙ্গেই ঐ নাচের আসর বসে। অন্যান্য দেবীপূজায়ও ওজাপালির অনুষ্ঠান একেবারে অপ্রচলিত নয়। জনজাতীয় বোড়োদের মধ্যে ওজাপালি নেই, কিন্তু দেওধনী নাচ রয়েছে। বোড়োদের সর্পদেবী মারৈ

পূজায় দেওধনী নাচ আবশ্যিক। সেখানে দেওধনী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মর্যাদা পায়। নাচও হয় অনেক বেশি উন্মাদনাপূর্ণ। শুনেছি, উদয়শঙ্কর তাঁর 'চণ্ডালিকা'র প্রযোজনায় প্রকৃতির মা মায়ার জাদুনৃত্যের পরিকল্পনায় বোড়োদের দেওধনী নাচের আদর্শটি ব্যবহার করেছিলেন। দেওধনী নাচের একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ হচ্ছে চামর। প্রসঙ্গটি পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব।

দেওধনী শব্দটির দেও অংশটি নিশ্চিতই দেবতার অপভ্রংশ। 'ধনী' বা 'ধনি'-র উৎস নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দটি দেবীর প্রতিভূ অথবা অন্তরঙ্গ পূজারিণী অর্থেই প্রয়োগ করা হয়। নৃত্যানুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে দেওধনীর উপর প্রায়শ দেবীর 'ভর' হয়। প্রায় সম্মোহিত দেওধনী তখন দর্শকদের প্রশ্নের উত্তরে ভবিষ্যৎবাণী করে। বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া বর্ণনা দিয়েছেন : 'এই দীর্ঘ নৃত্যকালত প্রথমে দেখা যায় ঘূরঘূরণি, তার পিছত আহে অঙ্গ-প্রলাপ আরু সম্পূর্ণ সম্মোহনের অবস্থা। এনে অবস্থাত দেবীয়ে দেওধনীক অনুগ্রহ করি দৈবশক্তি দান করা বুলি দর্শক আরু সাধকসকলে বিশ্বাস করে। অঙ্গ-প্রলাপত দেওধনীয়ে কোয়া কথাবোরক বিশেষ অর্থ সংযুক্ত করি দৈববাণী বুলি ধরা হয়।'[৩] দেওধনীরা সাধারণভাবে বর্ণহিন্দু সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়, কিন্তু বিশেষ অনুষ্ঠানে তার মর্যাদা দেবীর মর্যাদারই অনুরূপ, উচ্চবর্ণের মানুষও তখন তাকে অবহেলা করতে সাহসী হয় না।

এই দেওধনীরা যে মাতৃতান্ত্রিক উপজাতীয় সমাজের নারী-পুরোহিতদেরই লুপ্তপ্রায় অবশেষ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। ঐ সমস্ত সমাজের দেবীরা অনেকেই পরবর্তী পর্যায়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। পূর্বাঞ্চলে মুখ্যত কালিকাপুরাণ এবং যোগিনীতন্ত্র তাদের উত্তরণের শাস্ত্রীয় পটভূমি নির্মাণ করেছে। ঐ সমস্ত পুরাণও অনেক ক্ষেত্রেই কামাখ্যা, ললিতকান্তা, ত্রিপুরাসুন্দরী বা উগ্রতারার উপজাতীয় স্বরূপটিকে সংরক্ষণ করেছে। পুরুষপ্রধান রাজতন্ত্রের হাত ধরে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন আসামে অনুপ্রবিষ্ট হলো, তখন দেওধনীদের একটা বড়ো অংশ পরিণত হলেন দেবদাসীতে। বস্তুত আসামের দেবদাসীদের ব্যাপক অস্তিত্বের যে চিত্রটি প্রত্নলিপির সাক্ষ্যে বিধৃত রয়েছে, পূর্বভারতের অন্যত্র তা সহজলভ্য নয়।[৪] রাজকীয় পরিমণ্ডল থেকে দূরে, কামরূপের অভ্যন্তরে, সমাজের বিবর্তন ঘটেছে অতি বিলম্বিত লয়ে এবং সেখানে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব, অন্তত ধর্মীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে, আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সে কারণে লৌকিক ধর্মাচারে দেওধনীদের প্রভাব আজও অপ্রতিহত।

নারী-পুরোহিতদের পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক প্রায়শই অচ্ছেদ্য। এ সম্পর্কে আধুনিক একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন একাধারে সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার। দৃষ্টান্তটি পূর্ব ভারতেরই, মণিপুর থেকে নেওয়া। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে মণিপুরে প্রথাগত ধর্মাচার আজ প্রায় অবলুপ্ত, তবু সেখানে তিনি পেয়েছিলেন ইমা রজনী মাইবীকে, যিনি মণিপুরের নারী-পুরোহিতদের আদিম ধারাকে আজও বহন করে চলেছেন। শ্রীমতী চাকী সরকারের বর্ণনা :

"মণিপুরের ইমা রজনী মাইবীর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৭৮ সালে। ওঁর বয়েস এখন ৭৯ বছর। লাইহরাওবা নৃত্যাচারে ওঁর কাংলেই থোকপা (অশ্বারোহণের নাচ) আর থাংকৎপা (অসিচালনার নাচ) ছিল বিখ্যাত। বশীকরণ বিদ্যায় ওঁর খ্যাতির কথা আগে শুনেছিলুম। একটু রাগ হলেই ওঁর ভর আসত। মণিপুরের মেইতেইরা তাকে বলেন লাইতোংবা, অর্থাৎ দেহে ভগবান ভর করেছেন। তখন উনি ভবিষ্যৎ-বাণী করতেন।...পাঁচ-ছয় শত মানুষ জড়ো হয়েছিল থোরাকখা মন্দিরের পাহাড়ী টিলার উপর। গভীর রাতের অন্ধকারে লাইহরাওবার 'লাইবৌ' অনুষ্ঠানে দু সারি হয়ে এঁকে-বেঁকে সাপের রেখার মতো রেখায় নক্সা করে গ্রামের মুখ্যপ্রধান, তার স্ত্রী, অবিবাহিত যুবক-যুবতীর দল, বিবাহিতা নারী, আর বাচ্চা মেয়েরা হান্ হো জাতীয় শব্দ করে যখন ঘুরত, ইমা যেতেন সকলের আগে আগে পাঁচজন নানা বয়সের মাইবীর সঙ্গে। মাইবীরা নানা ভঙ্গিতে করতেন হাকচাংসোবা, অর্থাৎ শিশুর মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম, শিশুর পালন, মানুষ হওয়ার নৃত্য।"[৫]

এই বর্ণনার প্রথম অংশ থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে মণিপুরের মাইবী নৃত্য কামরূপের দেওধনী নৃত্যেরই স্বগোত্র এবং দ্বিতীয় অংশ থেকে বোঝা যায় যে এই ধরনের নৃত্যের একটা বড়ো অংশই মূলত fertility rite বা উর্বরা-শক্তির আরাধনা।

৩

নারী-পুরোহিতদের ধর্মাচারণমূলক নৃত্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিপাদ্যের সম্পর্ক ক্রমশ প্রকাশ্য। আপাতত আরেকটি ধর্মাচারের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখানে নারী-পুরোহিত নেই, তার স্থান নিয়েছে নপুংসক পুরোহিত।

সুরমা-বরাক উপত্যকায় অর্থাৎ শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে ভরাই নামে একজন লৌকিক দেবীর পূজানুষ্ঠান হয়। এই দেবী প্রচণ্ডভাবে জনপ্রিয় তথাকথিত

নিম্নবর্ণের মধ্যে, যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের লোকেরাও এ পূজায় অংশ নেন। দেবীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নপুংসক ব্যতীত অন্য কেউ তার পূজার পৌরোহিত্যের অধিকারী নন। এই নপুংসক পুরোহিতকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'গুরমা'।

মূখ্যত সন্তান-কামনায় ভরাই পূজার অনুষ্ঠান হয়। চতুর্ভুজা দেবী রক্তবর্ণা এবং সম্পূর্ণ নগ্নিকা। দেবীর একহাতে পদ্ম, একহাতে শঙ্খ, একহাতে সাপ এবং চতুর্থ হাত তার লজ্জা নিবারণ করছে। একটি কচ্ছপ, তার উপর একটি কলসী, সেই কলসী থেকে দেবী উত্থিতা। দেবীপূজার কোনো নির্দিষ্ট তিথি নেই, তবে যে-কোনো মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিই বিধেয়। ডিমের রিচুয়াল ব্যবহার এ পূজার একটি বৈশিষ্ট্য। সাতটি ডিম পূজার উপাচারের মধ্যে রাখা হয়। শেষ পর্বে একটি উন্মুক্ত খড়্গকে লক্ষ করে ডিমগুলো ছোড়া হয়। খড়্গের ধারালো দিক লেগে যদি ডিমগুলো কেটে যায়, তবে তা সুলক্ষণ। সর্বশেষ ডিমটিতে সিঁদুর দিয়ে একটি মনুষ্যমূর্তি আঁকা হয়। গুরমা পুরোহিত ডিমটি ছুঁড়ে দেবে শূন্যে। লোকবিশ্বাস—ডিমটি যদি শূন্যে মিলিয়ে যায়, তবেই পূজার উদ্দেশ্য সফল। বাস্তবে গুরমার হাতসাফাইয়ের পারদর্শিতার উপরই পূজার্থীর মানসিক সন্তুষ্টি নির্ভরশীল।

রাত্রিব্যাপী গুরমার নৃত্য এ পূজার আবশ্যিক অঙ্গ। গুরমা তার নাচ-গানের দল নিয়ে আসে। তার পরনে নারীর পোশাক, অঙ্গে নর্তকীর সজ্জা, হাতে থাকে চামর। তার সঙ্গীরা সবাই স্বাভাবিক পুরুষ। নাচ শুরু হয় ছন্দোবদ্ধভাবে মৃদঙ্গ ও করতালের সংযোগে, কিন্তু রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজনার ছন্দ বদলে যায়, নাচও উত্তাল হতে থাকে। একেবারে শেষ পর্যায়ে উন্মত্ত অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির মধ্যে নাচ শেষ হয়। নাচের সঙ্গে যে গান থাকে, তাতে প্রথম থেকেই অশ্লীলতার আভাস থাকে, শেষে তা কদর্য অশ্রাব্য হয়ে দাঁড়ায়। নাচের অন্তে গুরমারও ভর হয়, তাকেও প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

প্রাসঙ্গিক বলেই ভরাই দেবীর চরিত্র নির্ণয়ে আমরা প্রয়াসী হচ্ছি। 'ভরাই' শব্দটি প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য—'ভর' বা ভয় থেকেই এটি নিষ্পন্ন। তাঁর মতে ভরাই হচ্ছে শিশুমনের ভয় তাড়ানোর দেবতা।[৬] ক্ষেত্র অনুসন্ধানে এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাইনি। যাঁরা এ পূজা করেছেন এবং যাঁরা দেবীর ভক্ত, তাঁরা সবাই সন্তান-কামনার সঙ্গে এ দেবীর সংশ্রব সম্পর্কে ঐকমত্য। অন্য দিক দিয়েও বিষয়টি পরীক্ষা করা যায়। দেবীর বাহন কচ্ছপ। আদিম লোকবিশ্বাসে কচ্ছপের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হতো, আমাদের আজকের মানসিকতা দিয়ে তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়।[৭] অধিকাংশ আদিম কল্পনাই কচ্ছপের দেবত্ব সম্পর্কে

নিঃসন্দেহ ছিল, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার সংশ্রবও সর্বত্র স্বীকৃত। কোলরা কচ্ছপকে জলদেবতা মনে করে। শতপথব্রাহ্মণে রয়েছে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত হওয়ার আগে নিজেকে কচ্ছপে রূপান্তরিত করেছিলেন। রেড ইণ্ডিয়ানরা কচ্ছপ শিকারের আনুষ্ঠানিক আয়োজন করে ফসলের জন্যে বৃষ্টির কামনায়। টোরি প্রণালীর সন্নিহিত দ্বীপগুলোতে কচ্ছপ শিকারের ডিঙি নির্মাণের সময়ে নানা ধরনের আচ্-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, সেগুলোতে যৌনতার অবাধ ছড়াছড়ি দেখা যায়। মৎস্য শিকারের সাফল্যের জন্যে ওখানে কচ্ছপকে কেন্দ্র করে নাচেরও প্রচলন রয়েছে। জাপানের চতুর্ভুজা আদি মাতৃদেবীর বাহন কচ্ছপ। আমাদেরও নদীদেবী যমুনার বাহন কচ্ছপ।

তথ্যগুলো থেকে মনে হয় যে ভরাই মূলত একজন জলদেবী। এমন নামের দুটি সূত্র থাকতে পারে। শ্রীহট্টিয় উপভাষায় 'ভুরা' বলতে এক ধরনের কচ্ছপ বোঝায় আবার 'ভর' (ডহর) বলতে বোঝায় নদী বা হাওর (বিস্তীর্ণ জলভূমি)-এর গভীরতম অংশকে। 'আই' বলতে মা বোঝায়, অন্য অনেক লৌকিক ভাষার মতোই। 'ভুরা' বা 'ভর'-এর অধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবী হিসেবে দেবী ভরাই নামটি অর্জন করেছেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। উইলিয়ম ক্রুক জানাচ্ছেন যে 'গন্ধার' নামে কোনো মৎস্যজীবী জাতি 'কলকুমারী' নামে এক দেবীর পূজা করে, যে পূজায় কচ্ছপ বলি দেওয়া হয়।[৮] কচ্ছপ বলিদানের বিধি ভরাই পূজায়ও রয়েছে। ক্রুক সাহেব গন্ধার বলতে কোন মৎস্যজীবী জাতিকে বুঝিয়েছেন, তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। 'কলকুমারী' যে মূলত কলসকুমারী তা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা চলে। শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলের মৎস্যজীবী কৈবর্ত-পাটনীদের মধ্যে ভরাই কলসকুমারী ও কলসবতী এই দুইটি নামেই পরিচিত এবং পূজিত।

জলদেবী বা নদীদেবী ভরাই কলসী-সম্ভূতাও। কলসী বা ঘট যে সন্তানদাত্রী মাতৃজঠরের বিকল্প তা বলাই বাহুল্য। ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বী এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করেছেন।[৯] ভরাই পূজায় ডিমের ব্যবহারও উর্বরতা শক্তির সঙ্গে তার সংস্রব প্রমাণ করে।[১০] দেখা যাচ্ছে মূলত জলদেবী ভরাই উর্বরা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে সন্তান কামনায় পূজিত হচ্ছেন। অর্থাৎ জলচরদের অধিষ্ঠাত্রী পরিণত হচ্ছেন সৃষ্টিকার্যের অধিষ্ঠাত্রীতে। ভূমিকার এই সম্প্রসারণ আদিম মানুষের যুক্তি-ধারার সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। ভরাই মূলত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের দেবী এবং মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যেই জলদেবী হিসেবে তাকে পূজা করা হতো। তার উর্বরতা শক্তি প্রথমে জলেই কার্যকর বলে ভাবা হতো, পরে অন্যান্য সম্প্রদায়-কর্তৃক

গৃহীত হওয়ার ফলে তার ক্ষমতার পরিধিও বিস্তৃত হয় এবং সাধারণভাবে উর্বরতা-শক্তির দেবীতে তিনি উন্নীত হন। জলদেবীর ক্ষমতার এই পরিধি বিস্তারটা লোকায়ত সমাজে বহু-প্রচলিত একটা সাধারণ লক্ষণ। এই প্রসঙ্গে ই. ও. জেমস-এর আলোচনায় দ্রষ্টব্য যে আকাশ-ঝরা আর ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্গে পশুচারণের তৃণভূমি এবং মানুষের কল্যাণে অন্য সব সুফলের যোগাযোগ থেকে আদিম মানব-মনে জলদেবী এবং সন্তানদায়িনী শক্তির ধারণা জড়িয়ে যায়।[১১]

৪

শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে গুরমা বা নপুংসক পুরোহিতরা উত্তর বা পশ্চিম ভারতের হিজড়েদের মতো মূথবদ্ধ জীবনযাপন করে না। পরিবার-সম্পৃক্ত তাদের একক জীবনযাত্রা অনেকখানিই স্বাভাবিক। দৈবশক্তির অধিকারী হিসেবে লোকায়ত সমাজে এরা কিছুটা ভীতি-মিশ্রিত সম্ভ্রমও আদায় করে। তবে দৈনন্দিন জীবন-চর্যায়ও এরা নারীর পোশাক পরে, চুল লম্বা রাখে এবং প্রসাধনও ব্যবহার করে। কথাবার্তা ভাবভঙ্গিও সর্বাংশেই মেয়েদের মতো। তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁকের উপকথা উপন্যাসের নসুবালা চরিত্রের আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে গুরমাদের অনেকখানি মিল রয়েছে।

অবশ্য দেবীর ভক্তরা জানেন না যে দেবীর পৌরোহিত্যের অধিকার বিশেষভাবে কেন গুরমাদের উপরই বর্তালো। ঐতিহ্যভিত্তিক একটা প্রথা তাঁরা অনুসরণ করেন মাত্র, এর পেছনে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক কাজ করছে কিনা, সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অনবহিত। অতএব ঐতিহ্যগত এই লোকবিশ্বাসের উৎস খুঁজতে হলে আমাদের দৃকপাত করতে হবে অন্যত্র, সমজাতীয় ধর্মাচার যেখানে প্রচলিত ছিল। বস্তুত নপুংসক পুরোহিতের অস্তিত্বটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার কিছু নয়, সুদূর অতীতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের পুরোহিত-বৃত্তি বেশ ব্যাপকভাবে বর্তমান ছিল।

পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একাধিক দেবীর পুরোহিত ছিলেন নপুংসক। ফ্রিজিয়ার দেবী সিবিলিকে রোমানরা নিজেদের দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল ২০৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। এই পর্যায়ে সিবিলির পুরোহিতরা ছিলেন নপুংসক। ফ্রেজার বর্ণনা দিয়েছেন : 'প্রাচ্য পোশাক পরিহিত এবং তাদের বক্ষদেশে ছোট ছোট মূর্তি ঝোলানো এই নপুংসকরা ছিল রোমের রাস্তায় একটি পরিচিত দৃশ্য। শহরের রাস্তায় রাস্তায় তারা মিছিল করে ঘুরত। তারা বহন করত দেবীমূর্তি

এবং একটানা খঞ্জনী, বাঁশি আর শিঙাধ্বনির সঙ্গে স্তবগান করে যেত। তার প্রচণ্ড টানে মিলত প্রচুর ভিক্ষা, মূর্তি এবং তার বাহকেরা নিমজ্জিত হতো গোলাপের বর্ষণে।[১২] গ্রীক আর্টেমিস এবং সিরিয়ার আসটার্টে (সৈথার) একই ভাবে নপুংসক পূজারীদের দ্বারা পূজিত হতেন।[১৩] এই-সমস্ত পুরোহিতরা অবশ্য গুরমা-দের মতো জন্মসূত্রে নপুংসক ছিল না, পূজারী সম্প্রদায়ে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার আগে এদের অঙ্গচ্ছেদ করা হতো। এ কাজে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হতে কিভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করা হতো, তারও বিবরণ দিয়েছেন ফ্রেজার আসটার্টের উৎসবের বর্ণনা প্রসঙ্গে : 'বাঁশির বাজনা আর ঢাকের আওয়াজের মধ্যে নপুংসক পুরোহিতরা তরবারি দিয়ে নিজেদের শরীরে এলোপাতাড়ি আঘাত করত। ধর্মীয় উত্তেজনা তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ত দর্শকের ভিড়ে এবং তাদের অনেকেই এমন কাজে মেতে উঠত যা ছুটির দিনে উৎসবগামী দর্শকের পক্ষে প্রায় অচিন্তনীয় ছিল। শিরায় শিরায় সংগীতের স্পন্দনে উত্তেজিত, রক্তের ফিনিকে মুগ্ধচক্ষু সব মানুষ একের পর এক নিজেদের বিবস্ত্র করে চীৎকার দিয়ে লাফিয়ে পড়ত এবং সেই উদ্দেশ্যেই সাজানো তরবারির একটি নিয়ে ওই স্থানেই নিজেদের খোজা করে ফেলত।'[১৪] রেড ইণ্ডিয়ানদের কোনো কোনো দেবীরও নপুংসক পুরোহিত ছিল, এদের অঙ্গচ্ছেদ হতো নিতান্ত শৈশবে।

বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন কালের এই সমস্ত নপুংসক পুরোহিতদের ক্ষেত্রে দুটো সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, সর্বত্রই এরা দেবীর পূজারী, কোনো পুরুষ দেবতার নয়। দ্বিতীয়ত, সকল ক্ষেত্রেই এরা নারীর পোশাক পরিধান করত। তাই মনে হয়, ডরাই দেবী এবং তার গুরমা পুরোহিতদের উদ্ভব কোনো একটা আপতিক ব্যাপার নয়। যে পটভূমিতে অতীতে বিভিন্ন দেশে দেবী-সাধনার সঙ্গে নপুংসক পুরোহিতদের সংস্রব গড়ে উঠেছিল, ডরাই ও গুরমার উদ্ভব ও অস্তিত্বের পটভূমি সাধারণভাবে তার চাইতে স্বতন্ত্র নয়। অর্থাৎ ডরাই হচ্ছেন পশ্চিম এশীয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় ঐ সমস্ত প্রতাপান্বিতা দেবীদের অজ্ঞাতকুলশীল সগোত্র।

জে. হেষ্টিংস সম্পাদিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকস' গ্রন্থে নপুংস পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে অনেকগুলি ব্যাখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত অভিমত পর্যালোচনার পর সেখানে ফার্নেলের (Farnell) অভিমতই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ফার্নেল বলেছেন, অঙ্গচ্ছেদনের মাধ্যমে নপুংসকত্ব গ্রহণে এই সমস্ত পুরোহিতরা আগ্রহী হতেন দেবীর সঙ্গে

একাত্মতা স্থাপন এবং দেবীর ক্ষমতার দ্বারা নিজেকে সঞ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে। নারীবেশ ধারণ করার মাধ্যমে ঐ রূপান্তরকেই আরো পূর্ণাঙ্গ করা হতো।[১৪]

আরেকটি তথ্যের উল্লেখ করলে কার্নেলের বক্তব্যের তাৎপর্য নিরূপণ সহজ হবে। শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে গুরমারা যে শুধু ভরাই পূজায়ই পৌরোহিত্য করে তাই নয়, অন্য একটি অনুষ্ঠানেও তাদের অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়। মনসা পূজার সময় রাত্রিব্যাপী যে মনসামঙ্গল গানের অনুষ্ঠান হয়, সেখানেও মুখ্য গায়কের ভূমিকা কিছুদিন আগে পর্যন্ত গুরমাদেরই একচেটিয়া ছিল। সেখানেও তাদের সেই নর্তকীর বেশ, সেই চামরের ব্যবহার—তবে অশ্লীলতার মাত্রা এখানে অনেক কম থাকে, সংগীত এবং নৃত্যাংশও অনেকখানি শিল্পসম্মত। এই সূত্রে গুরমারা আবার সর্পাঘাতের চিকিৎসকও, তাই মনসামঙ্গল অনুষ্ঠানে তাদের অভিধা হয় 'ওঝা'। এই সংগীতানুষ্ঠানের স্থানীয় নাম ওঝাগান অথবা পদ্মাপুরাণ গান। মনসা পূজার পৌরোহিত্যে অবশ্য গুরমাদের ভূমিকা নেই, কিন্তু ওঝাগানে তাদের অগ্রাধিকার স্বীকৃত।

মনসা পূজার সঙ্গে গুরমার এই সম্পর্কটা খুব স্বাভাবিক কারণেই স্থাপিত হয়েছে। ভরাই মূলত জলদেবী, মনসাও তাই, তার জন্মও জলাশয়ে। মনসামঙ্গলে জালো ও মালোর যে কাহিনী রয়েছে তাতে মনে হয় মনসা ছিলেন ধীবরদেরও দেবী। প্রভোৎ মাইতি তাঁর বিস্তৃত গবেষণার অন্তেও সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন।[১৫] ভরাই সর্পধারিণী, সেই সূত্রে সর্পদেবীও বটে। মনসা পূজা লোকসমাজে তুলনা-মূলক বিচারে অনেক বেশি আদৃত এবং বিস্তৃত, সেক্ষেত্রে সবলতর কাল্ট হিসেবে তা যে ভরাইকে আত্মস্থ করতে চাইবে তা খুবই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে অনেক অঞ্চলেই ভরাই-বিষহরি একই দেবী বলে গণ্য হন এবং মনসা মূর্তিতে ভরাই পূজার অনুষ্ঠানও বিরল নয়। আশুতোষ ভট্টাচার্যও 'ভরাই-বিষহরি' এই যুগ্ম অভিধাটি ব্যবহার করেছেন। আত্মীকরণের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে গুরমারা যে মনসা পূজার নৃত্যগীত অংশে নিজেদের স্থান করে নেবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মনসা পূজা শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে প্রচণ্ড জনপ্রিয়, পূজা হয় প্রায় প্রতি ঘরে। তার মধ্যে সমৃদ্ধ গৃহস্থরাই শুধুমাত্র ওঝা গানের অনুষ্ঠান করেন। এদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। সামাজিক কারণে পেশাদার গুরমার সংখ্যা এখন ক্ষয়িষ্ণুর দিকে, শ্রাবণ সংক্রান্তির নির্দিষ্ট তারিখে অন্তর্গত যে মনসামঙ্গলের আসর বসে, সে চাহিদার তুলনায় তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। এই চাহিদা জন্ম দিয়েছে নতুন একদল পুরুষ গায়কের, যারা 'ওঝা' অভিধাটি ব্যবহার করে।

এখন ওঝা বলতে মুখ্যত এই পুরুষ গায়কদেরই বোঝায়। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই ওঝারাও কিন্তু মনসামঙ্গল আসরে নারীবেশে অবতীর্ণ হয়, হাতে থাকে চামর, সর্বাংশেই তারা গুরমার অনুকরণ করে। নারীবেশ ধারণ সম্পর্কে এদের দৃঢ়মূল প্রত্যয় যে অন্য বেশ পরে অনুষ্ঠান করলে দেবীর কোপদৃষ্টি পড়বে। ওঝাদের মধ্যে আমরা তাই এমন একটি গোষ্ঠীকে পাচ্ছি সচেতনভাবেই যারা একটি আরোপিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে এবং আরোপণকে ফলপ্রসূ করার জন্যে ধর্মাচারসম্মত নারীবেশ ধারণ করছে। বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে ধর্মাচার-সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের হাতবদলটা একটি জীবন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের সামনেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ধর্মাচারের বিবর্তনের পর্যায় নিরূপণে জীবন্ত এই দৃষ্টান্তটি সাক্ষ্য হিসেবে মূল্যবান।

এই ধরনের ক্ষেত্রে পুরুষকর্তৃক নারীবেশ ধারণও কিন্তু একটা প্রচলিত প্রথা। প্রথাটিকে Transvestism নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এই ধরনের নারীবেশধারী পুরুষ পূজারীর সন্ধান অনেক পাওয়া যায়।[১৭] ভারতের বাইরে তাহিতি ও বৃটিশ গিনির উপজাতীয় পুরোহিতদের গোটা জীবনটাই নারী-বেশে কাটাতে হয়।[১৮] প্রাচীন ক্রীটেও এমন পুরোহিতের প্রাচুর্য ছিল। ক্রীটের এই পুরোহিতদের উদ্ভব সম্পর্কে জি. গ্লস-এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।[১৯]

৫

নপুংসক পুরোহিতদের উদ্ভব প্রসঙ্গে কার্নেলের এবং প্রাচীন ক্রীটে পুরুষ পুরোহিতদের নারীবেশ ধারণ সম্পর্কে বর্ণনা মিলিয়ে দেখলে পুরোহিতবৃত্তির বিবর্তন সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মানো সম্ভব। এর মধ্যেও একটা প্যাটার্নের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যে প্যাটার্নের অজ্ঞাত অংশের উপর আলোকপাত করতে গুরমার বিকল্প হিসেবে পুরুষ ওঝার উদ্ভব-সংক্রান্ত তথ্যটি আমাদের কাজে লাগে। ছকটাকে এমন এভাবে সাজানো যায় : আদি পর্যায়ে নারী-পুরোহিত, মধ্য পর্যায়ে নপুংসক পুরোহিত এবং শেষ পর্যায়ে নারীবেশধারী পুরুষ পুরোহিত। নপুংসক পুরোহিতদের আবার দুটো ধারা : স্বাভাবিক নপুংসক এবং কৃত্রিম পদ্ধতিতে ছিন্নমুষ্ক নপুংসক। এ ছকটা প্রযোজ্য অবশ্য দেবীপূজার ক্ষেত্রে, পুরুষ দেবতার ক্ষেত্রে নয়।

পুরোহিতবৃত্তির এই পরিবর্তন সমাজ-নিরপেক্ষভাবে ঘটেনি, সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। সামান্য অনুসন্ধানেই প্রকট হয় যে নারী,

নপুংসক এবং নারীবেশধারী পুরোহিতরা যে দেবীদের আরাধনা করেন, তাঁরা সবাই মূলত উর্বরা শক্তির প্রতীক। তাঁরা দেবীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন সেই সূত্রে। রবার্ট ব্রিফল্ট খুব বিস্তৃতভাবেই দেখিয়েছেন যে আদিম কৃষিজীবী মানুষ কিভাবে জমির উর্বরা শক্তি এবং নারী সন্তানপ্রসবিনী ক্ষমতাকে এক এবং অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করত।[২০] সেই কারণে কৃষিকাজভিত্তিক জাদুক্রিয়াগুলিতে নারীর একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত ছিল, যার রেশ আমাদের ব্রতাচারগুলিতে এখনো টিঁকে আছে। একজন রেড ইন্ডিয়ান সর্দারের বক্তব্য তিনি উদ্ধৃত করেছেন। জনৈক মিশনারির প্রশ্নের জবাবে ঐ সর্দার বলেছিল যে মেয়েরাই জানে কী করে অধিক ফসল ফলাতে হয়, কারণ তারা সন্তান উৎপাদন করে। আদিম কৃষিজীবী মানুষের এই দৃঢ়মূল সংস্কারই উর্বরা শক্তির দেবী এবং তাদের নারী-পুরোহিতকে একটি বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এই ধরনের সমাজে স্বাভাবিকভাবেই মাতৃপ্রাধান্য দীর্ঘ দিন বজায় ছিল। পরবর্তীকালে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ, লাঙলের প্রচলন, উদ্বৃত্ত সম্পদের সৃষ্টি এবং তজ্জনিত সামাজিক পটপরিবর্তনের ফলে যখন পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন দেবীর পুরোহিত পদ থেকে নারীর অপসারণের প্রক্রিয়াও শুরু হলো। মেরলিন স্টোনের ভাষায় : 'It seems quite possible that as man began to gain power within the religion of the goddess, they replaced priestesses.'[২১] উদ্বৃত্ত সম্পদ প্রতিষ্ঠিত পুরুষশাসিত সমাজে নিয়ে এল নতুন ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ। কৃষিজীবী গোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ সেই প্রক্রিয়ায় পরিণত হলো নবোত্থিত অভিজাত শ্রেণীর দাসে অথবা প্রজায়। কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত সমাজের অর্থনীতির নিয়ামক হিসেবে কৃষির মুখ্য ভূমিকা বজায় রইল, তাই কৃষিজীবী সমাজের প্রচলিত উৎপাদনভিত্তিক ধর্মাচারগুলির উপর সরাসরি নতুন ধর্মাদর্শ চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হলো না। যাদের শ্রমে ফসল উৎপন্ন হবে, তাদের মনে প্রাচীন সংস্কারগুলো তখনও দৃঢ়মূল। ধীরে ধীরে নারীর অন্তঃপুরে নির্বাসন যখন পাকাপোক্ত হলো, ধর্মীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তখন নিশ্চিত কিছু সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল—কারণ পুরুষ পুরোহিত কর্তৃক উর্বরা শক্তির দেবীর আরাধনার ব্যাপারটা কৃষিজীবীদের পক্ষে অনায়াসে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এই ধরনের কোনো একটা যুগসন্ধিতেই আপস-প্রয়াস হিসেবে নপুংসক পুরোহিতবৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কোসাম্বী দেখিয়েছেন যে ভারতীয় ধর্মাদর্শে অর্ধনারীশ্বরের কল্পনাটি এই ধরনের আপস-প্রয়াস হিসেবেই উদ্ভূত।[২২] রূপকল্পনায় অর্ধনারীশ্বর এবং বাস্তব

ধর্মাচারে নপুংসক পুরোহিত একই ধরনের চিন্তাচেতনার ফসল হওয়াই স্বাভাবিক, দুয়ের বস্তুভিত্তিও সমজাতীয় হওয়ারই কথা।

দেবীরা যেখানে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পেয়েছিলেন, নপুংসক পুরোহিতবৃত্তি সেখানে প্রতিষ্ঠানগত মর্যাদা পেয়েছিল। সিবিলি, আর্টেমিস বা আসটার্টের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। যেখানে সে ধরনের আনুকূল্য পাওয়া যায়নি, সেখানে এই মধ্যবর্তী পন্থাটা লোকায়ত সমাজ তার নিজের প্রয়োজনেই গড়ে তুলেছিল। দেবী ওরাই তারই দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সামাজিক আদর্শের রূপান্তরের ফলে আনুষ্ঠানিক অজচ্ছেদের ব্যাপারটা যখন নিন্দনীয় বা আইন-বহির্ভূত হয়ে দাঁড়াল, তখন স্বভাবতই জন্মসূত্রে নপুংসকদের উপর পুরোহিতবৃত্তির দায়িত্ব পড়ল। উল্লেখ্য যে ওরমারা যদিও জন্মসূত্রেই নপুংসক, কিন্তু অতীতে অজচ্ছেদের মাধ্যমে পুরোহিত সংগ্রহের রীতিও সম্ভবত শ্রীহট্ট অঞ্চলে ছিল : আইন-ই-আকবরী-তে বলা হয়েছে শ্রীহট্ট থেকে প্রচুর পরিমাণে খোজা দাস চালান যেত। কৃত্রিম উপায়ে বালকদের ধরে ধরে পুরুষত্ব নষ্ট করে তাদের দিল্লি প্রভৃতি জায়গায় পাঠানো হতো। মনে হয় পুরোহিত সৃষ্টির কারণে একই ধরনের রীতি এ অঞ্চলে ছিল বলেই মুসলমান আমলে খোজার ব্যবসাটা এত ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক, তয় ও পরবর্তী পর্যায়ে সামাজিক দৃষ্টিতে ক্লীবত্বের স্বীকৃতিটা যখন লোকলজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, এমন-কি পৌরোহিত্যের বাড়তি সম্মানটুকু দিয়েও সে লজ্জা ঢাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন জন্মসূত্রে যারা নপুংসক তারাও এই ধরনের পুরোহিতবৃত্তির পথ পরিহার করতে শুরু করল। এই ধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতেই নপুংসক পুরোহিতের সংখ্যাল্পতা দেখা দিল বা ঐ ধরনের পুরোহিতবৃত্তি উঠেই গেল। তখনই নারীবেশধারী পুরুষ পুরোহিতের আবির্ভাব ঘটল।

বিবর্তনের এই পর্যায়গুলো সর্বত্রই যে যান্ত্রিক নিয়মে পর পর সংঘটিত হয়েছে এমন নয়, কোথাও হয়তো মধ্যবর্তী পর্যায়টা অনুসৃতই হয়নি, কোথাও হয়তো বা প্রাচীনতম প্রথাটিই টিঁকে রয়েছে, কোথাও নারী-পুরোহিত থেকে হয়তো সরাসরিই দেবীপূজার দায়িত্বটা পুরুষ পুরোহিতের হাতে চলে গেছে। কোথাও পুরুষ পুরোহিতের পাশাপাশি নারী-পুরোহিতও বিরাজ করছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে এ ব্যাপারে যে একটা বিবর্তন প্রক্রিয়া কাজ করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না এবং এই বিবর্তন ক্রিয়ার পেছনে লোকায়ত সমাজের যে চিন্তাধারা কাজ করেছে, আমাদের বিশ্লেষণই তার নিকটতম, এমন মনে করার কারণ রয়েছে।

মহারাষ্ট্রে দেখতে পাই, এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার সবগুলি পর্যায়ই পাশাপাশি

বিরাজ করছে। কোসাম্বী তার একটা বিবরণ দিয়েছেন : 'কেবল সাধারণ পুরোহিতরা দেবীর সেবা করে না। আরাধীরাও সেবা করে। এই পুরুষদের পোশাক আর জীবনযাপন স্ত্রীলোকের মতো, যদিও পবইয়াদের মতো তারা খোজা নয়। সমকামিতার উদ্দেশ্যে রক্ষিত পুরুষও তারা নয়। বিশেষ বিশেষ দিনে কোন্ধনপুর এবং রামখাভাতে তারা দেবীর পূজা করে, পুনাতে বহন করে দেবীর ধাতুমূর্তি, কিংবা অংশ নেয় লোকায়ত দেবী পূজার উৎসবে।... উল্লেখযোগ্য যে পন্ধরপুরে যমাবাঈ-এর আরাধনীরা স্ত্রীলোক এবং নিম্নশ্রেণীর গণিকা। এরা যে শুধু দেবীকে দর্শন করে এবং দেবীর সেবা করে তা নয়। এক অসাধারণ মশাল নৃত্যের অনুষ্ঠানও এরা পালন করে। প্রচলিত ধারণা যে, মূর্তি বাইরে আনা হোক বা না-হোক, তাদের সেই পবিত্র নৃত্যের সময় দেবীও সঙ্গে থাকেন।'[২৩] নৃতত্ত্ববিদ হাটন উল্লেখ করেছেন মহারাষ্ট্রের এক ধরনের পুরোহিতের, যারা নারীবেশধারী ও স্বাভাবিক নপুংসক।[২৪]

দেওধনী গুরমা ওঝাদের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের লৌকিক দেবীর এই সমস্ত পুরোহিতদের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। এই সাদৃশ্য আপতিক নয়, উপমহাদেশের পূর্বতম প্রান্ত ও পশ্চিমতম প্রান্তের সামাজিক বিবর্তনের ধারাটি একই খাতে বয়ে চলেছে বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে।

৬

নারী-পুরোহিতের বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী যে পর্যায়ে নপুংসক পুরোহিতদের অবস্থান, আমরা বৃহন্নলাকে সেই পর্যায়েরই স্মারক হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছি। মহাভারতের কাহিনীটি যে রূপে আমরা পাই, তাতে বৃহন্নলার পুরোহিতবৃত্তির কোনো আভাস নেই। কিন্তু নৃত্যগীতবিদ্যায় তার পারদর্শিতার কথা বেশ বিস্তৃত-ভাবেই রয়েছে। উল্লেখ্য, নপুংসকত্বের সঙ্গে নৃত্যগীতাশ্রিত সংলগ্ন পৌরোহিত্যের সূত্রেই আরোপিত হতে দেখা যায়। সিবিলির ক্ষেত্রে তাই দেখেছি, গুরমার ক্ষেত্রেও। এমন-কি গ্রীক আর্টেমিসের নপুংসক পুরোহিতের পরোক্ষ প্রভাব যখন গ্রীক অর্থডক্স চার্চের সূত্র ধরে রাশিয়ায় অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন খ্রীস্টধর্মের অভ্যন্তরেই স্কপ্‌টসি (Skoptsy) নামক যে নপুংসক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তারাও নৃত্যগীতের মাধ্যমেই তাদের গোপন ধর্মাচার সম্পন্ন করত।[২৫]

কিন্তু বৃহন্নলা উপকাহিনীর সূচনাপর্বে মহাভারতে স্পষ্টতর ইঙ্গিত এ সম্পর্কে রয়েছে। অর্জুন তার নপুংসকত্ব অর্জন করেছেন উর্বশীর অভিশাপে। রূপক বর্জন

করলে দাঁড়ায় এই নপুংসকত্ব উর্বশীরই দান। এখন, এই উর্বশীর যথার্থ পরিচয় কি? কোসাম্বী বিশদ পর্যালোচনা করে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে উর্বশী এবং অন্য অপ্সরারা আসলে আদিম সমাজের মাতৃকাদেবী, জলদেবী বা নদীদেবী থেকে রূপান্তরিতা[২৩] এবং এদের সম্পর্কে প্রাচীন সাহিত্যে যে-সমস্ত কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে, তার অনেকগুলিতে সেই দেবীর মানবী-প্রতিভূ (নারী-পুরোহিত) কর্তৃক আচরিত অনুষ্ঠানভিত্তিক জাদু ক্রিয়ার (ritual magic) অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। কোসাম্বী তাঁর প্রতিপাদ্যের সমর্থনে বিস্তর তথ্য এবং যুক্তি দিয়েছেন —সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু বৃহন্নলা কাহিনীর অভ্যন্তরেই এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে যে দু-একটি তথ্যের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি নির্দেশ করব।

উর্বশী অর্জুনের প্রেম ভিক্ষা করছেন এবং অর্জুন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন —এই ঘটনাটি বৃহন্নলা কাহিনীর একটি মৌল উপাদান। লক্ষণীয় ভূমধ্যসাগরীয় এবং পশ্চিম এশীয় দেবী কাহিনীগুলির এটা একটা সাধারণ (common) মোটিফ।[২৬] অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে দেবী (বাস্তব ক্ষেত্রে হয়তো তাদের মানবী-প্রতিভূ) বিভিন্ন বীরকে কামনা করছেন, আর ঐ সমস্ত বীর নায়করা দেবীকে কোথাও বিনম্র বচনে, কোথাও সভয়ে প্রত্যাখ্যান করছেন। জন গ্রে প্রত্নলিপির সংলাপ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে সুমেরের অর্ধ-ঐতিহাসিক বীর গিলগামেশ তীব্র ভাষায় দেবী ইসথারকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[২৭] বিখ্যাত রাসসামরা প্রত্নলিপিতে পাই যে রাজপুত্র আখ্‌ত-এর হাতে দেবী আনাথ-এরও এমনি বিড়ম্বনা ঘটেছিল।[২৮] গ্রীক মিথগুলি আলোচনা করে রবার্ট গ্রেভ্‌স এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে প্রাক-হেলেনিক যুগে কামার্তা দেবী অনিচ্ছুক দেবতাকে তাড়া করে বেড়াতেন আর পুরুষ-প্রধান হেলেনিক যুগে দেবতাই তাড়া করতেন অনিচ্ছুক দেবীকে।[২৯] দেবীর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হতে দেবতা কিংবা বীর নায়কদের যে অনিচ্ছা, তার মূলে রয়েছে দেবী পূজার সঙ্গে জড়িত অন্য একটি ধর্মাচার, যে ধর্মাচার অনুসারে দেবীর মানবী-প্রতিভূরা প্রতি বৎসর একজন করে প্রণয়ী গ্রহণ করতেন এবং বৎসরান্তে সেই প্রণয়ীকে বলিদান করা হতো। যাই হোক, অর্জুন যে উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তার মধ্যে আমরা সেই সাধারণ মোটিফটিই খুঁজে পাচ্ছি, যা অন্যান্য দেবী-কাহিনীর মধ্যেও লভ্য।

আরেকটি ছোট সাক্ষ্য রয়েছে। অর্জুন উর্বশীকে তাদের বংশের আদিমাতা হিসেবে সম্ভাষণ করেছেন। উর্বশী-পুরুরবা কাহিনীর সূত্রেই অপ্সরার এই সম্মান।

এখানে স্মর্তব্য যে প্রাচীন দেবীরা সকলেই নিজ নিজ সমাজে আদিমাতা হিসেবে স্বীকৃত এবং সেই সূত্রেই তারা মাতৃকাদেবী। উর্বশীও মূলত তাদেরই একজন, এই উল্লেখের মধ্যে সেই সারকটুকু রয়ে গেছে।

উর্বশীর নারী-পুরোহিতদের নিয়ে কিছু ধর্মাচার গড়ে উঠেছিল এবং তার অবশেষ ঋগ্বেদের যুগেও টিঁকে ছিল, তা কোসাম্বী দেখিয়েছেন। অন্যত্র আমরা পাচ্ছি যে এই ধরনের দেবীদের পূজার অধিকার নারীর হাত থেকে নপুংসকরা একটা পর্যায়ে গ্রহণ করেছিলেন ; কাহিনীতে রয়েছে যে বৃহন্নলার নপুংসকত্ব অর্জিত হয়েছিল এই ধরনের মাতৃদেবীরই মাধ্যমে। আবার মাতৃদেবীর নপুংসক পুরোহিতের ধারাটা এদেশের লোকায়ত সমাজে আজও বহমান এবং দেশের পূর্বতম প্রান্ত থেকে পশ্চিমতম প্রান্ত পর্যন্ত তা বিস্তৃত। সেক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না যে বৃহন্নলা উপাখ্যান এই ধারারই একটি প্রাচীন অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে এবং ধারাটি যথেষ্ট বেগবান ছিল বলেই তা মহাভারতের বুকে স্থান করে নিতে পেরেছে।

মহাভারতের উপাখ্যানগুলো অধিকাংশই তার আদিম অবয়বে টিঁকে নেই। বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী তার সংস্কার হয়েছে। পরবর্তী রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে তার মৌল উপাদানগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বর্জিত হয়েছে। যে ধরনের সমাজবিন্যাসে নারী-পুরোহিত এবং তাদের উত্তরসূরী নপুংসক পুরোহিতরা বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী ছিল, সে সমাজবিন্যাসের কাঠামোটিকে বিনষ্ট করেই পুরুষপ্রধান আর্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা। মহাভারতের সংস্কারকার্যও সাধিত হয়েছে সেই ধর্মেরই প্রবক্তাদের হাতে। অতএব বৃহন্নলা যে ধর্মাচারের সঙ্গে সংস্রববিহীন শুধুমাত্র নৃত্যগীতবিদ্যায় পারদর্শী হিসেবেই টিঁকে থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। উচ্চকোটির সমাজ যেখানে সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহীনভাবে নিজেদের সামাজিক আদর্শকে লিপিবদ্ধ করেছে, সেখানে মাতৃপ্রাধান্যের সমস্ত চিহ্নকে নিঃশেষে বিলোপ করার দিকেই ছিল তাদের প্রবণতা। পুরাকাহিনীর ক্ষেত্রে ততটা সম্ভব ছিল না, কারণ ওগুলি ছিল জনসংযোগের মাধ্যম। নীচের তলার মানুষের ধ্যানধারণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলে তার উপযোগিতাই নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই মাতৃপ্রাধান্যের কিছু কিছু স্মারককে টিঁকিয়ে রাখতে হলো, কিন্তু পুনঃপুনঃ সংস্কারের প্রক্রিয়ায় সেগুলির স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিত অনেকটাই বদলে গেল। শুধু বৃহন্নলার কাহিনী নয়, বিষ্ণুর মোহিনীরূপ ধারণ, নারদের নারীত্ব প্রাপ্তি, শাম্বের গর্ভধারণ, অহল্যার সংস্রবে ইন্দ্রের নপুংসকত্ব প্রাপ্তি—এগুলি সবই মাতৃ-

প্রাধান্যের কোনো-না-কোনো পর্যায়ের স্মারক। পুরাকাহিনী এগুলিকে আশ্রয় দিয়েছে সত্য, কিন্তু অনিচ্ছুক আশ্রয়দাতাদের হাতে তার সযত্ন সংরক্ষণ হয়নি।

৭

কামরূপের ওঝাপালি নাচের সঙ্গে বৃহন্নলার সংশ্রবজনিত লোকবিশ্বাস দিয়ে আমরা এ আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। খুবই সম্ভব যে এই সংশ্রবটা আরোপিত, মহাভারতের প্রভাবে পরবর্তীকালে সংযোজিত। কিন্তু লোকবিশ্বাস অনেক সময়েই তার নিজস্ব পদ্ধতিতে সামাজিক ইতিহাসের উপাদানকে সংরক্ষণ করে। তেমনই কোনো উপাদান এই লোকস্মৃতির মধ্যে নিহিত কিনা, তাও পর্যালোচনাযোগ্য।

ওঝাপালির আদি প্রবর্তক বৃহন্নলা, এটাই লোকস্মৃতি। ওঝাপালিতে অবশ্য নপুংসক পুরোহিত নেই, কিন্তু তার পূর্বসূরী নারী-পুরোহিত 'দেওধনী' রয়েছে। দলের মধ্যে দেওধনীর স্থান দ্বিতীয়, ওঝাই মুখ্য। বোড়োদের 'দেওধনী' অবশ্য প্রাচীন গুরুত্ব নিয়েই বর্তমান। প্রতিবেশী শ্রীহট্ট-কাছাড়ে বৃহন্নলা-সদৃশ নপুংসক গুরমাদের আমরা পাচ্ছি, পাচ্ছি তাদেরই উত্তরসূরী মনসামঙ্গলের নারীবেশধারী পুরুষ ওঝাদের। এই দেওধনী, গুরমা বা ওঝারা যে মনসা, ভরাই বা মাটির দেবীর পূজায় অংশগ্রহণ করে, এই দেবীরাও সবাই মোটামুটি সমগোত্রীয়। মনে হয়, এই সমস্ত দেবী ও তাদের পুরোহিতরা একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে উদ্ভূত।

ওঝাপালিতে দেওধনীর প্রবেশ যে ঘটেছে বোড়োদের সূত্রে, সেটা তো নিঃসংশয়ে ধরে নেওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম আসামের অসমীয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনজাতীয় বোড়োদের রক্তের যে ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছে, বিশেষত সমাজের তথাকথিত নিচুতলার মধ্যে, সংস্কৃতিতেও তার আনুপাতিক প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে। এদিক দিয়ে দেওধনী তথা ওঝাপালি নৃত্যকে আমরা ইন্দো-মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির লক্ষণাক্রান্ত বলে ধরে নিতে পারি। আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর কিরাত-জন-কৃতি গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে সুরমা উপত্যকায়ও এককালে বৃহত্তর বোড়োগোষ্ঠীর ব্যাপক বিচরণ ছিল, যারা অনেকেই স্থানীয় জনসমাজে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু শুধুমাত্র এটুকু দিয়ে গুরমা নাচের উপর ইন্দো-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাব অনুমান করা যায় না। কিন্তু গুরমারা যে চামর ব্যবহার করে তাদের নাচের অবিচ্ছেদ্য উপকরণ হিসেবে এবং যে চামরের ব্যবহার মনসামঙ্গলের পুরুষ ওঝারা নিয়েছে গুরমাদের কাছ থেকে, তার সাক্ষ্যটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই চামর দেওধনীরাও ব্যবহার করে। এটি নিশ্চিতই ইন্দো-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক

প্রভাবের স্বাক্ষর। চামর তৈরি হয় চমরী গাই-এর পুচ্ছ থেকে, এবং চমরী গাই তিব্বত এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলেই লভ্য। সরাসরি সাংস্কৃতিক সংস্রব ব্যতীত 'চামর' কখনো সুরমা উপত্যকার লোকনৃত্য আর লৌকিক ধর্মাচারে আবশ্যিক উপকরণরূপে গৃহীত হতো না।

ইন্দো-মঙ্গোলীয় প্রভাবের ব্যাপারে দ্বিতীয় সমর্থন পাচ্ছি 'গুরমা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি থেকে। অবশ্য এ ব্যাপারে একটা অন্য মত রয়েছে, এবং প্রথমে তার উল্লেখ করে নিতে চাই। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার আঞ্চলিক অভিধানে শব্দটির 'নপুংসক' অর্থটি দেওয়া আছে, কিন্তু অভিধানে শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়নি। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক তাঁর 'অপরাধ জগতের অভিধান'-এ 'গুরমা' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন শব্দটি এসেছে 'গুরুমা' থেকে (অর্থাৎ গুরুপত্নী বা নারীগুরু অর্থে)। ব্যাখ্যাটা একটু কষ্টকল্পিত, যদিও কোন পার-প্রেক্ষিতে শব্দটি তিনি ব্যবহৃত হতে শুনেছেন, তার বিবরণ থাকলে আমাদের উপলব্ধি স্পষ্টতর হতো। যাই হোক, অন্য একটি সূত্র থেকে যে তথ্য পেয়েছি, তাতে কিন্তু 'গুরমা'কে তার যথার্থ স্বাভাবিক পরিমণ্ডলেই সংস্থাপন করা সম্ভব। জন্মসূত্রে অস্ট্রিয়ান, হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী অগেহানন্দ তন্ত্র-সম্পর্কিত একটি আলোচনায় জানাচ্ছেন যে তিব্বতী তন্ত্রাচারে নর্তকীদের বলা হয় 'গর-মা (gar-ma)।[১০] বোড়োদের দেওধনী থেকে সুরমা উপত্যকার 'গুরমা' পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক মেল-বন্ধনের পরিচয় আমরা পাচ্ছি তাতে তিব্বতজাত চামরধারিণী গুরমাদের আমরা যদি তিব্বতীয় নর্তকী গরমার সাংস্কৃতিক উত্তরসূরী বলে চিহ্নিত করি, তবে বোধ হয় তেমন কোনো আপত্তি উঠবে না।

আরেকটি তথ্য উল্লেখ করি, প্রাসঙ্গিক কিনা তা পাঠক বিচার করবেন। ভূটান-সংলগ্ন গোয়ালপাড়া কোচবিহার জেলায় এক ধরনের যৌনব্যাধিকে বলা হয় 'গুরমি'। বলা প্রয়োজন যে ঐ সমস্ত অঞ্চলে শীতের সময়ে পাহাড় থেকে ভূটানীরা নেমে আসে, সঙ্গে থাকে নানা ধরনের পাহাড়জাত পণ্য। বাণিজ্যিক লেনদেনের সুবিধের জন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট স্থানে প্রতি বৎসরই মেলা বসে, এগুলিকে বলা হয় ভূটানী মেলা। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছে। এই মেলায় অন্য লেনদেনের সঙ্গে দেহের পসরাও বেশ ব্যাপকভাবেই চলে। এক ধরনের ভূটানী নারী ঐ ব্যবসায় লিপ্ত থাকে (রঙিয়া থেকে ত্রিশ মাইল দূরে দরঙ্গা বলে ভূটান সীমান্তবর্তী একটি স্থানে এ ধরনের মেলা স্বচক্ষে দেখারও সুযোগ হয়েছে)। এই দেহোপজীবিনীদের গুরমা বা গরমা বলা হয় কিনা, তা অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভূটান ও তিব্বত এত ঘনিষ্ঠ যে এদের অভিধা 'গরমা' বা কাছাকাছি উচ্চারণের কিছু হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের অনুমান, ব্যাধিটি মুখ্যত এদের মাধ্যমে সংক্রমিত হয় বলেই এর নাম গুরমি। তিব্বতীয় বা ভূটানী নর্তকী, যারা আদি পর্যায়ে নিশ্চিতই ছিল নারী-পুরোহিত, তাদের বারবণিতায় পরিণত হওয়াটাও আকস্মিক নয়, সর্বত্রই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় তাই ঘটেছে। কোসাম্বীর ভাষায় : 'উর্বশীরা মুছে যায়, কিন্তু তারাই সেই দেবীদের পূর্বসূরী, উত্তরকালের দেবলোকে প্রধান প্রধান দেবতা যেসব দেবীকে যজ্ঞে বিবাহ করেছিলেন। আর মৌর্যযুগের প্রাক্কালে বাণিজ্যিক সমাজ এবং মুদ্রার অর্থনীতির উদ্ভবে উর্বশীর জীবন্ত প্রতিনিধিদের পরিণাম দেখি গণিকাবৃত্তির ব্যবসাতে।'[৩১]

৮

ওয়াপা'ল-গুরমা নৃত্যাদিকে যদি ইন্দো-মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত বলে মেনে নেওয়া যায়, তবেই প্রশ্ন উঠবে যে, এই সংস্কৃতির প্রভাব-পরিসর কতখানি বিস্তৃত ছিল। মহাভারতের বৃহন্নলা সংশ্লিষ্ট বিরাট নগরের সঙ্গে, যা ছিল মৎস্য-রাজ্যের রাজধানী। মৎস্য দেশ বলতে বোঝাত বর্তমান জয়পুর-আলোয়ার-ভরতপুর অঞ্চলকে। ইন্দো-মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হওয়া সম্ভব ছিল কি না, সেটাই আপাতত বিচার্য।

হরাপ্পায় প্রাপ্ত কঙ্কালগুলোর একটিকে নৃতত্ত্ববিদরা ইন্দো-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর বলে নির্ণয় করেছেন। তথ্যটির উল্লেখ করেছেন পিগট (Piggot) তাঁর *Pre-historic India* বইয়ে। মাথার খুলির ভিত্তিতে জাতিনির্ণয় আজকাল তত নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না, তবুও তথ্যটির গুরুত্ব রয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার যুগে লোথাল (গুজরাট) সামুদ্রিক বন্দর থেকে অথবা স্থলপথে যে সমস্ত পণ্যাদি নিকটপ্রাচ্য বা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যেত, তার একটা বড়ো অংশই আসত হিমালয়-সংলগ্ন অঞ্চল থেকে।[৩২] অথর্ববেদে কিরাতকন্যার ভেষজ সংগ্রহের উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উত্তরাপথ বাণিজ্যের প্রাচীনত্বের কথা বলা হয়েছে, সেই বাণিজ্য নিশ্চিতই হিমালয়-জাত পণ্যাদিকে অবহেলা করত না। নন্দদের আমলে মগধ সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকে ব্যাপ্তির একটা বড়ো কারণই ছিল এই উত্তরাপথ বাণিজ্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা।[৩৩] মৌর্যযুগে দক্ষিণাপথ বাণিজ্যের উপর জোর দেওয়া যে শুরু হয়, তার উল্লেখ অর্থশাস্ত্রেই রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণ বাণিজ্যের সংযোগ ঘটানোর

জন্যেই মৌর্যরা দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তীকালে মথুরা নগরীর গুরুত্ব বেড়ে যায় এই দুই বাণিজ্যপথের সংযোগ কেন্দ্র হিসেবেই।[৩৪] সাতবাহন যুগে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে যে সমস্ত বাণিজ্য গড়ে ওঠে, মথুরা ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মৎস্যরাজ্য ছিল মথুরারই অদূরে, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত অভিমুখী বাণিজ্যপথের সন্ধিস্থলে।

পণ্যের লেনদেন সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের পথও প্রশস্ত করে। উত্তরাপথে বাণিজ্যের সূত্রে হিমালয় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রভাব চতুঃপার্শ্বস্থ জনপদে কতখানি পড়েছিল, তা নির্ণয় করার মতো লিপিপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই। নাগার্জুনকুণ্ডের একটি লিপিতে শুধু পাচ্ছি যে উপাসিকা বোধিশ্রী খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে সেখানে যে বিহারটি নির্মাণ করিয়েছিলেন, চীনা তীর্থযাত্রীরাও সেখানে আশ্রয় লাভ করত।[৩৫] কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন মগধে চীনাংশুকের আর মথুরাতে কুষাণ যুগেই রেশমবস্ত্র উৎপন্ন হতো। এই বিদ্যাটিও হিমালয় অঞ্চল থেকেই গেছে, এমন অনুমান করা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত অজ্ঞাত গ্রীক নাবিকের বর্ণনায় যে 'কিরাদিয়া' রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই কিরাতভূমি তো হিমালয় সন্নিকটে হওয়ারই কথা। সেখানে চীনা রেশম বস্ত্রের আদান-প্রদানের কথা রয়েছে।[৩৬]

সাংস্কৃতিক প্রভাবের নিদর্শন যদি আমরা সংস্কৃতির নিজস্ব ক্ষেত্রে খুঁজি, তবে অপ্রত্যক্ষ কিন্তু যুক্তিসহ ইঙ্গিত বোধহয় আরো কিছু পাওয়া যায়। ধনের দেবতা কুবের এবং তার সহচর যক্ষদের সম্পর্কে উত্তর-দক্ষিণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিতে যে সমস্ত কল্পনা ও কাহিনী প্রচলিত, সেগুলির মধ্যে বহুতর ধারা এসে মিশেছে সত্য, কিন্তু মূলত কুবের, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিম্পুরুষ এরা সবাই যে হিমালয় অঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তার বিস্তর প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্যে রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃত চিন্তায় এদের যে বিপুল প্রভাব, তা কোনোরূপ বাস্তব সংস্রব ব্যতিরেকেই সম্ভব হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো দুরূহ। ধনাধিকারীরূপে কুবেরের প্রতিষ্ঠার পেছনে বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সরাসরি সংস্রব ছিল, এমন চিন্তাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[৩৭]

আমাদের আলোচনার জন্যে কুবের বা যক্ষরা ততখানি প্রাসঙ্গিক নয়, যতখানি যক্ষিণীরা। যে পাথুরে প্রমাণ আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমাদের ধারণা যক্ষিণীর মাধ্যমে তার সন্ধান লাভ সম্ভব। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র এবং উড়িষ্যায় প্রচুর সংখ্যক যক্ষিণীমূর্তি পাওয়া গেছে। লাস্যময়ী এই সমস্ত

যক্ষিণীদের উর্বরাশক্তির প্রতীক বলে মনে করা হয়।[৩৮] এক বিশেষ শ্রেণীর মূর্তিতে দেখি যক্ষিণীরা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে অথবা বৃক্ষে হেলান দিয়ে দণ্ডায়মান। এই মোটিফটি সম্পর্কে বেঞ্জামিন রোলাণ্ড বলেছেন যে, যক্ষিণীর আলিঙ্গনের জন্ত বৃক্ষের আকুলতায় যৌনমিলন এবং মুকুলিত বৃক্ষের উপমা ভারতীয় পুরাণ কাহিনীতে ফিরে ফিরে আসে এরকম বিশ্লেষণে। যক্ষিণীর উপর যে সমস্ত শক্তি আরোপ করা হয়েছে, তার সবগুলোই আমরা পূর্বে আলোচিত দেবীদের মধ্যে লক্ষ করেছি। এদিক দিয়ে যক্ষিণীরা তাদের বা তাদের নারী-পুরোহিতদের সগোত্র।

বৃক্ষ আলিঙ্গনের যে প্রথাটিকে রোলাণ্ড বলেছেন 'forgotten rite'[৩৯]—তার ধরনটা কি রকম ছিল, তা কিন্তু আমরা মহাভারতে পেয়ে যাই। পরশুরামের জন্ম প্রসঙ্গে মহাভারতে রয়েছে, 'মহর্ষি ভৃগু পুত্রবধূ সত্যবতীকে পুত্রসন্তান লাভের জন্ত পৃথক পৃথক ভাবে দুইটি বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতে বলিয়াছিলেন, তোমার মাতা অশ্বত্থ বৃক্ষকে এবং তুমি উডুম্বর বৃক্ষকে।...তাহারা বৃক্ষ আলিঙ্গনে ভুল করিলেন এবং ভৃগু প্রদত্ত চরুভক্ষণেও বিপরীত কাজ করিলেন' (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ)। বৃক্ষ এবং মানুষের উর্বরতা শক্তি এখানে একাকার হয়ে গেছে। যক্ষিণীরা এ-ধরনের জাদুক্রিয়ার সঙ্গেই যুক্ত ছিল এবং সেই বার্তাই প্রস্তরাষিত রূপে আমাদের সামনে 'বরাভিত।

যক্ষিণীদের সঙ্গে উর্বরাশক্তির সংস্রবের জন্তেই আমরা তাদের উল্লেখ করছি। হিমালয় অঞ্চলের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক ছিল, তার একটি বিশেষ নিদর্শনও বর্তমান। অনেকগুলি মূর্তিতেই যক্ষিণীরা চামরধারিণী। অর্থাৎ সেওধনী-ওরমার এই নৃত্য উপকরণটি যক্ষিণীদের হাতেও উঠেছে এবং সেখানেই এর ব্যবহার থেমে থাকেনি। তার পর চামর উঠেছে দক্ষিণ ভারতীয় দেবদাসীদের হাতে। মধ্যযুগের কর্ণাটকে উৎকীর্ণ বহু ভূমিদানলিপিতে চামরধারিণী দেবদাসীদের উল্লেখ রয়েছে।[৪০] বস্তুত দেবদাসীদের চামরধারিণী অংশটি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল, দানলিপিতে তাদের 'চামরম সুলে' (chamaram sule) অথবা 'চামরাদো সুলে' (chamarada sule) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত হিন্দু রাজসভায় চামরধারিণী যে সমস্ত প্রতিহারিণীকে আমরা সিংহাসনের পাশে দেখতে পাই, তারাও ঐ দেবদাসী ধারারই বিবর্তিত অবশেষ। অলকা পরাশর এবং উষা নায়ক দেবদাসী-সংক্রান্ত একটি সমীক্ষায় লিখেছেন : 'দশম শতাব্দীর উপান্তে শুধু যে মন্দিরের কাঠামোয় রাজপ্রাসাদের সাদৃশ্য এল তাই নয়, বিগ্রহের

সেবায় দেবদাসীদের কার্যতার বিশেষ মিল খুঁজে পেল রাজন্যদের নির্দিষ্ট দাসদাসীদের কর্তব্যে।... মৎস্তপুরাণে দেবদাসীর কর্মতালিকার এক সুদীর্ঘ বর্ণনায় একটি প্রধান কাজ হলো, রাজা, ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রসহ অন্যান্য খরিদ্দারকে সেবা করা।'[৪২] সামন্তবাদী সমাজে রাজা যতই দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, দেবদাসীরা ততই পরিণত হয়েছে রাজভোগ্যা দেহ-পসারিণীতে।

উড়িষ্যার একটি জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্যে চামর এখনো আবশ্যিক উপকরণ। 'পালা নৃত্য' নামে পরিচিত এই নৃত্য মূলত ধর্মাচারভিত্তিক, অনুষ্ঠানের আগে তাই বিস্তৃত প্রস্তুতির প্রয়োজন, যার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে ঘটস্থাপন।[৪২] এই ঘটের সঙ্গে উর্বরাশক্তিভিত্তিক জাদুক্রিয়ার সংস্রবের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এই নাচের দলের সভ্যরা সবাই পুরুষ। মূল গায়কের হাতে থাকে চামর। যারা নাচে তারা কিন্তু নারীবেশী, পায়ে নূপুর (স্থানীয় ভাষায় ঘু-ঙরা, শব্দটির মূল ঘুঙুর না ঙরমা?), গায়ে গয়না। এদের সম্পর্কে নারায়ণ ত্রিপাঠীর মন্তব্য : "The use of female garments by some members of the pala party suggests its original introduction by the dancing girls"।[৪৩] এই নৃত্য সহযোগীদের বলা হয় 'পালিয়া'। ওঝাপালিতে সহযোগী শিল্পীদের 'পালি' বলা হয় ; শুধু এই সাদৃশ্যের জন্যে নয়, 'পালা' এবং 'ওঝাপালি'র মধ্যে সামগ্রিক যে সাদৃশ্য বর্তমান, তাতে মনে হয় একই সাংস্কৃতিক প্রবাহ থেকে এ-দুটি লৌকিক নৃত্যাচার উৎসারিত।

মৌর্যযুগের পরেও ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে মাতৃপ্রাধান্যের স্মারক অবশিষ্ট ছিল, সেই অঞ্চলগুলোকে প্রত্নলিপির সাহায্যে চিহ্নিত করা যায়। মথুরা, কোসাম্বী, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র ও উড়িষ্যায় এই প্রাধান্যের সামাজিক অস্তিত্ব ছিল।[৪৪] তাছাড়া যক্ষিণীমূর্তির ব্যাপক প্রতিফলনও ঘটেছে ঐ সমস্ত অঞ্চলেই। দক্ষিণ ভারতে মাতৃপ্রাধান্যের লক্ষণ তো এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। ইরাবতী কার্ভে দেখিয়েছেন যে মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের কিছু কিছু উচ্চবর্ণের মধ্যেও ঐ অবশেষ কিভাবে টিঁকে রয়েছে।[৪৫] আবার সুধাকর চট্টোপাধ্যায় পূর্ব রাজস্থানবাসী মৎস্যদের যদুবংশীয় বলে চিহ্নিত করেছেন।[৪৬] রমিলা থাপারের মতে যদুবংশীয়দের মধ্যেই মাতৃপ্রাধান্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।[৪৭] মনে হয় বিস্তৃত এই অঞ্চলে মাতৃপ্রাধান্যের ব্যাপক প্রভাব গোড়া থেকেই ছিল। এই ধরনের সমাজে স্বভাবতই মাতৃকাদেবীকে ঘিরে নারীকেন্দ্রিক ধর্মাচারগুলি গড়ে ওঠে। নৃত্যগীত ঐ ধরনের ধর্মাচারের আবশ্যিক অনুষঙ্গ। কথক নাচের জয়পুরী

ধর্মাশায় মাতৃদেবীর আরাধনার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে নৃত্য-পরিকল্পনা ধর্মাচার-বিযুক্ত অবস্থায় এখনো রূপায়িত হয়, তার উৎস সম্ভবত ঐ ধরনের দেবী আরাধনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মীরাবাঈও সেই একই ধারার বৈষ্ণবীয় পরিণতি হওয়াই সম্ভব। দক্ষিণ ভারতে মাতৃদেবীর নারী-পুরোহিতরা ধর্মাচারের সঙ্গে যুক্ত রইল বটে, কিন্তু পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোয় তাদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলো এবং দেবদাসীরূপে পুরুষ দেবতা তথা পুরুষ সমাজের চরণেই হলো তাদের উৎসর্গ।

সুদূর মহারাষ্ট্রে দেবীর পূজারীরূপে নপুংসকদের আমরা পাচ্ছি। রাজস্থান-উত্তরপ্রদেশে এদের অন্য ধরনের অস্তিত্ব রয়েছে। সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এখনো হিজড়েরা সংঘবদ্ধভাবে বাস করে। সন্তান জন্মের পর প্রতিটি গৃহস্থঘরে তাদের প্রথাসিদ্ধ অনিবার্য আবির্ভাব নিত্যই সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ঐ সময়ে তারা যে-নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করে তা নিশ্চিতই 'রিচুয়াল' নৃত্য। এদের সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন নির্দেশ করে যে এককালে তাদের একটা প্রতিষ্ঠানগত ভিত্তি ছিল। এটা সম্ভবপর যে উর্বরাশক্তির পূজক হিসেবে নিজেদের অতীত প্রতিষ্ঠিত ভূমিকা সম্পর্কে একটি ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি তাদের মধ্যে বহমান এবং সন্তান জন্মের পর গৃহস্থের নিকট থেকে ছলে-বলে-কৌশলে অর্থ আদায়ের চেষ্টার মাধ্যমে তারা তাদের অতীত অধিকারটই প্রয়োগ করে মাত্র। ওরাই সম্ভবত বৃহন্নলার উত্তরসূরী, ধর্মীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদের অতীত আরো মর্যাদাময় ছিল বলেই সম্ভবত মহাভারতের বুকে বৃহন্নলাকে আশ্রয় দিতে হয়েছে। নারী-পুরোহিত এবং তার বিবর্তিত নপুংসক রূপ যে-ধরনের ধর্মাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সমজাতীয় ধর্মাচার হিমালয় অঞ্চলেও ছিল এবং উভয়ের মধ্যে যে সংযোগ ঘটেছিল, যক্ষিণী এবং তাদের হস্তধৃত চামর তারই বার্তাবাহী। উড়িষ্যার 'পালা' নাচ সে সংযোগের আরো বিস্তৃত প্রসারভূমির সাক্ষ্য দেয়। ওঝাপালির সঙ্গে বৃহন্নলার সংশ্রবের লোকস্মৃতি সম্ভবত সেই ধরনের সংযোগেরই কোনো একটা পর্যায়কে ধরে রেখেছে। বৃহন্নলার শিষ্যার নাম যে ছিল 'উত্তরা', সেটা স্থানবাচক অভিধাও হতে পারে। কারণ উত্তরার ভাইয়ের নামও ছিল 'উত্তর'।

৯

দেবীর সঙ্গে সাযুজ্যসৃষ্টির কামনায় স্বীয় অঙ্গচ্ছেদকেও শ্রেয় বিবেচিত হতো যে-যুগে, বিচিত্র সেই ধর্মোন্মাদনার যুগের অবসান ঘটেছে বহু দিন। সামাজিক বিবর্তনের একটা বিশেষ পর্যায়ে যুগসন্ধির প্রয়োজন মেটাতে নপুংসক পুরোহিত-

বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ধারার কিছু অবশেষ টিঁকে রয়েছে এ কারণেই যে এদেশে সমাজবিকাশের প্রক্রিয়াটি অসম এবং অসমাপ্ত। উচ্চকোটির সমাজ নিজের শ্রেণীস্বার্থে পরিবর্তিত যে উপরিকাঠামো তৈরি করে, তার প্রভাব সমাজের সকল অংশকে সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত করে না, নিম্নকোটির সমাজ তার অতীত চিন্তা-চেতনাকে আরো সুদীর্ঘ দিন আঁকড়ে ধরে রাখে। এবং সময়ে সময়ে অনুকূল পরিস্থিতিতে তা উপরিকাঠামোকে নতুন করে প্রভাবিতও করে। নারীত্ব অর্জনের যে কামনা থেকে নপুংসক পুরোহিতের সৃষ্টি, সেই কামনার কোনো অভিঘাত দেশের প্রতিষ্ঠিত কোনো ধর্মাদর্শকে পরোক্ষেও প্রভাবিত করেছে কিনা, সেটাও অনুসন্ধান-যোগ্য। আচার্য সুনীতিকুমার শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারকে লেখা একটি চিঠিতে সাধারণভাবেই এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, যা এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক।

১৯৩২ সালে লেখা ঐ চিঠিতে সুনীতিকুমার নবদ্বীপের একটি বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন : 'রাত্রে ছিল রাধারমণ আশ্রমে (ললিতা দেবীর সমাজবাড়িতে) শারদ রাসোৎসব। ললিতা দেবীর পরিচয় জানেন, চরণদাস বাবাজীর শিষ্য, সখীভাবে সাধনা করেন, স্ত্রীলোক সাজিয়া থাকেন (ব্রজগোপী)। ... ললিতা দেবী শ্বেত বা শুক্ল অভিসারিকার বেশে, কীর্তন করিতে করিতে বাইজীদের মত 'ভাও বাতলানো' ভাবে অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিতেছেন, তাহার পরনে সাদা মখমলের ঘাগরা, শাড়ি-ওড়না, তাহাতে সাদা জড়ির পাড়, হাতে গহনা, নাকে বেসর, নথ ও নাকছাবি, প্রৌঢ় বয়সের gross চেহারার পুরুষ, চোখে কাজল, মুখে সকালে কামানো সত্ত্বেও দাড়ির রেশ, আর গায়ে তিনি শিশি দুই অতি উগ্র গন্ধের এসেন্স ঢালিয়াছেন।... সঙ্গে আটজন বৈষ্ণব বাবাজী সাদা কাপড়ে ঘেরে সাজিয়া এক একটি সখীর মূর্তি ধরিয়া উদ্দণ্ড নাচিতেছেন। যা হোক ব্যাপারটা দেখিয়া মনে বেশ একটা আঘাত লাগিল, একটা জুগুপ্সার ভাব আসিল, সাবেককালের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেন বৈষ্ণব জনসাধারণকে প্রশ্রয় দিতেন না, তাহার একটুখানি ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আথেন্সের জেউস বা হেলিয়স বা আথেনে দেবতার ভক্ত শিক্ষিত কোনো প্রাচীন যুগের গ্রীকের কাছে, এশিয়া মাইনর হইতে আগত কোনো অ-হেল্লেনীয় দেবতার নারীবেশী ছিন্নমুষ্ক পূজকদের উদ্দণ্ড বাদ্য ও নৃত্যদর্শনে কিরূপ জুগুপ্সার ভাব উদয় হইত, তাহার একটি আভাস বার বার মনের মধ্যে যেন আসিতে লাগিল।'[৫৮]

সুনীতিকুমার এখানে লঘুভঙ্গিতে পত্রই রচনা করেছেন, গবেষণায় যাননি।

কৃত্যটি কিন্তু অবলীলায় তাকে ভূমধ্যসাগরীয় ছিন্নমুষ্ক নপুংসক পুরোহিতদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এখানে বর্ণনা পাচ্ছি বৈষ্ণবীয় একটি ধর্মাচারের। বৈষ্ণব দর্শনের একটা ধারাও কিন্তু সখীভাব এবং রাধাভাবের সাধনাকে সর্বাধিক মর্যাদা দেয়। সে-দর্শনের রচয়িতারা মূলত ছিলেন মথুরা-সংলগ্ন বৃন্দাবনবাসী। নারীদের সঙ্গে সাযুজ্য কামনার বাস্তব স্থূল প্রয়াস জন্ম দিয়েছে নপুংসক পুরোহিতদের, এক হিসেবে রাধাভাব বা সখীভাবের সাধনা সেই কামনারই দার্শনিক রূপান্তর মাত্র। উভয়ের মধ্যে বাস্তবিকই কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঐতিহাসিক সংযোগ ছিল কিনা, তা যোগ্যতর গবেষকের বিস্তৃত অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

প্রাচীন ভারতে মাতৃগোত্র

মহাভারতের সাবিত্রী-উপাখ্যানে মাতৃপদবী বা মাতৃগোত্র ব্যবহারের উল্লেখমাত্র রয়েছে, তার বিস্তৃত কোনো বিবরণ সেখানে অনুপস্থিত। সৌভাগ্যবশত এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে, বিশেষত উপনিষদে, মাতৃপদবী ব্যবহারের আরও কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে, একটু চেষ্টা করলে যার পটভূমিকে একটু স্পষ্টতর রূপে উপস্থাপিত করা সম্ভব। তারও পরবর্তীকালে, একেবারে ঐতিহাসিক যুগে, একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে একটি বিশেষ সময়ে মাতৃপদবী (এক্ষেত্রে মাতৃগোত্র কথাটি আরও সুপ্রযুক্ত, কারণ পদবীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে বংশ পরম্পরায়) ব্যবহারের আরও ব্যাপক কিছু নিদর্শন রয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির যে রূপটি সাধারণো প্রচারিত—তা পিতৃপ্রধান সমাজের রূপ, মাতৃপদবীর এই ধরনের ব্যবহারকে অনায়াস স্বাভাবিকতায় সেখানে সংস্থাপন করা যায় না। অথচ এই রীতির উৎস এবং প্রচলন নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ধরনের কার্যকারণ সম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এবং এদেশের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে তার একটা যোগসূত্র থাকারই কথা। প্রধানত দুটি কারণে সে যোগসূত্রটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। প্রথমত, পর্যাপ্ত উপাদানের অভাব; দ্বিতীয়ত, সঠিক পদ্ধতির প্রয়োগে অনীহা। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কারণটির ভূমিকাই মুখ্য। কারণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, উপাদানের অভাব তাদের নিত্যদিনের সমস্যা, তৎসত্ত্বেও কিন্তু কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। আসলে যে ধরনের সামাজিক সংগঠনে আমরা বাস করি, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ইতিহাসচিন্তার ক্ষেত্রেও তা কতকগুলি সীমাবদ্ধতা তৈরি করে, এবং সেই সীমাবদ্ধতার প্রাকারকে অস্বীকার করতে না পারলে প্রাচীন যুগের অন্যতর কোনো সামাজিক সংগঠনের কোনো বিশিষ্ট রীতি সম্পর্কে সত্য সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হওয়া দুরূহ। মাতৃগোত্র সম্পর্কিত যে-সমস্ত আলোচনা আমাদের চোখে পড়েছে, বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমব্যতীত সবগুলিই দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত এই দুর্বলতার দ্বারা আক্রান্ত। ব্যতিক্রমগুলিতে সঠিক পথনির্দেশ রয়েছে, কিন্তু যেহেতু সেগুলিতে বিষয়টি এসেছে প্রসঙ্গক্রমে, প্রতিপাদ্য হিসাবে নয়, অতএব মাতৃগোত্র ব্যবহারের যথার্থ পটভূমির বিশ্লেষণ এবং উন্মোচনের কাজটা এখনও বাকি রয়ে গেছে।[১]

কালানুক্রম বিচার করলে উপনিষদে বিবৃত মাতৃপদবীর আলোচনাই প্রথমে শুরু করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু তথ্যের বিচারে সাতবাহনযুগের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান তুলনামূলক বিচারে সুবিধাজনক, কারণ এযুগের কিছু প্রত্নলিপির সাক্ষ্য আমাদের হাতে রয়েছে। তাই আমরা সাতবাহন যুগ দিয়েই আলোচনা শুরু করছি, আমাদের ধারণা এযুগের পটভূমিটি যদি স্পষ্টতর করা যায়, তবে জ্ঞাত তথ্যের আলোকে অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত ঔপনিষদিক যুগটিকেও বুঝতে সুবিধে হবে।

প্রত্নলিপিতে মাতৃগোত্র ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলনের নিদর্শন সাতবাহন যুগের লিপিমালার মধ্যেই আমরা পাচ্ছি। তার আগেরও একটা-দুটো নিদর্শন রয়েছে, কিছু নিদর্শন রয়েছে পরবর্তী কালেরও (ব্যবহারিক সুবিধার জন্য এই গোটা কালসীমাকেই আমরা সাতবাহন যুগ বলব)। সাতবাহন রাজাদের কালানুক্রমিক বংশতালিকা নিঃসংশয়ে নিরূপিত নয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ গৌতমীপুত্র সাতকরণির পরবর্তী সাতবাহনরা যে সবাই মাতৃগোত্র ব্যবহার করতেন, সেটি তথ্য হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ধরনের নামের যে উল্লেখগুলি সাতবাহন প্রত্নলিপি ও মুদ্রার মাধ্যমে পাওয়া গেছে, তার তালিকা নীচে দেওয়া গেল :

গৌতমীপুত্র সাতকরণি
বশিষ্ঠিপুত্র পুলোমায়ী
বশিষ্ঠিপুত্র সাতকরণি
গৌতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী
বশিষ্ঠিপুত্র যজ্ঞশ্রী সাতকরণি[২]
বশিষ্ঠিপুত্র চতরপণ সাতকরণি
মাঢ়রীপুত্র স্বামী শকসেন
কৌশিকীপুত্র সাতকরণি[৩]
বাশিষ্ঠিপুত্র বিলিবায় কুরুষ
মাঢ়রীপুত্র শিবকুরুষ
গৌতমীপুত্র বিলিবায় কুরুষ
বশিষ্ঠিপুত্র শিবশ্রী[৪]।

সাতবাহন রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি রাজ্য গড়ে উঠেছিল, ইক্ষ্বাকুবংশীয়রা ছিলেন এ-ধরনের একটি রাজ্যের অধিপতি। এদেরও মাতৃগোত্র ব্যবহারের রীতি ছিল। নাগার্জুনকুণ্ডের লিপিতে এই বংশের তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায় :

বশিষ্টিপুত্র শ্রীচান্তমূল

মাঢ়রীপুত্র বীরপুরুষ দত্ত

বশিষ্টিপুত্র বাহুবল চান্তমূল[৫]।

দাক্ষিণাত্যের আরেকটি গুরুত্বহীন রাজবংশের মাতৃগোত্রধারী দুজন রাজার নাম পাওয়া যাচ্ছে, রাজবংশটির নাম চুত্ত বংশ।

হারীতিপুত্র বিষ্ণুকড় চুত্ত কুলানন্দ সাতকরণি

হারীতিপুত্র বৈজয়ন্তীপতি শিবস্কন্দবর্মন[৬]।

আরেকটু দক্ষিণ-পূর্বের পৃথাপুরমে একটি নাম পাওয়া যাচ্ছে বশিষ্টিপুত্র শক্তি বর্মণ।[৭] গুজরাট অঞ্চলের আভীররাজাও মাতৃগোত্র ব্যবহার করেছেন, তার নাম ছিল মাঢ়রীপুত্র ঈশ্বর সেন।[৮] মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন মাঘবংশীয় রাজারা, তাদের নাম ছিল :

বশিষ্টিপুত্র ভীমসেন

কৌৎসীপুত্র প্রৌষ্ঠশ্রী

কৌশিকীপুত্র ভটদেব[৯]।

উত্তর ভারতেও যে মাতৃগোত্রধারী রাজারা একেবারে অনুপস্থিত ছিলেন, তা নয়। প্রথম শতাব্দীর কৌসাম্বীতে রাজত্ব করতেন :

গার্গীপুত্র বিশ্বদেব

গোপ্তিপুত্র ত্যাগরাজ

বাৎসীপুত্র ধনভূতি[১০]।

এদের রাজত্ব ছিল দক্ষিণ কৌসাম্বীর ভারহুতের কাছে। মথুরাতে ঐ সময়েই রাজত্ব করতেন :

গোপালীপুত্র সূর্যমিত্র

বাৎসীপুত্র ভাদপাল ধনভূতি[১১]।

আরো উত্তরে পাঞ্চাল রাজ্যে আরো তিনজন রাজার নাম পাওয়া যাচ্ছে :

শৌনকায়নীপুত্র বঙ্গপাল

ত্রৈবর্ণীপুত্র ভাগবত

গোপালিকা বৈহিদারীপুত্র আষাঢ় সেন[১২]।

সাতবাহনযুগে বিভিন্ন অভিজাত সামন্ত ও রাজপুরুষরা মহাভোজ, মহারথী এবং মহাতালেবর উপাধি ব্যবহার করতেন। এরকম প্রচুর নাম প্রত্নলিপিতে রয়েছে এবং দেখা গেছে, প্রায় প্রত্যেকেই মাতৃপদবীধারী এবং পদবীগুলো সাতবাহন

রাজাদের গোত্রনামেরই অনুরূপ। যথা: গৌতমীপুত্র, বশিষ্ঠিপুত্র, কৌশিকীপুত্র, কৌৎসীপুত্র, হারীতীপুত্র ইত্যাদি। অভিজাত সমাজের বাইরেও কিছু মানুষ মাতৃগোত্র ব্যবহার করতেন, তবে তাদের সংখ্যা কম। এদের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত মাতৃগোত্রের নাম পাচ্ছি, যথা: ক্রৌঞ্চিকাপুত্র, নন্দাপুত্র, সতীপুত্র, শারীপুত্র, ভার্গবীপুত্র ইত্যাদি।

দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ এবং মধ্যভারতেরই এ-ধরনের নামের ব্যাপক প্রচলনের প্রমাণ আমরা পাচ্ছি, কিন্তু উত্তর ভারতও এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। কুষাণযুগের আগে-পরে মথুরায় মাতৃগোত্রের বেশ ব্যাপক ব্যবহারই ছিল,[১৩] কৌশাম্বী ও পাঞ্চালেও এই রীতির বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ছিল, তার উল্লেখ আমরা আগে করেছি।

২

এদেশের ইতিহাসের এ কটি বিশেষ পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় মাতৃগোত্রের এই ব্যাপক ব্যবহার গোড়া থেকেই ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধিৎসাকে উদ্দীপিত করেছিল। এর উৎস এবং তাৎপর্য নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের মতামত প্রকাশ করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রচলিত সেই সমস্ত মতামতের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা প্রথমেই দরকার।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কানিংহাম এবং বুহ্‌লার—এই তিনজন মোটামুটি একই মত প্রকাশ করেছেন। বুহ্‌লার বলছেন এই প্রথা হচ্ছে রাজাদের বহুবিবাহ প্রথার ফসল, রাজপুতনাতে এখনও ছেলেকে মায়ের নাম অনুসারে চিহ্নিত করা হয়।[১৪] রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তাই বলেছেন, "The name was just intended to distinguish the king from other sons of his father by naming his mother according to her family name"।[১৫] অতি সহজ সমাধান, রাজারা বহুবিবাহ করতেন, রাজপুত্ররা কোন রানীর ছেলে ধরা যেত না, তাই পরিচয়ের সুবিধার্থে রানীদের তাদের পিতৃবংশের নাম অনুসারে ডাকা হতো, আর ছেলেদের নামের আগেও সেই নাম জুড়ে দেওয়া হতো। আমরা বিস্মিত হই যখন দীনেশচন্দ্র সরকারও সমজাতীয় মতের প্রবক্তা হিসাবে দাঁড়িয়ে যান।

দীনেশবাবুর সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ: এক, অসংখ্য সংভাইদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য রাজাদের নামের আগে মাতৃপরিচয় দেওয়া হতো; দুই, নারীরা বিয়ের পরও পিতৃগৃহের গোত্র ব্যবহার করতেন, অর্থাৎ যিনি 'গৌতমী'

লিখছেন, তাঁর পিতৃগৃহের গোত্র হচ্ছে 'গৌতম'। তিনি, এমনটি ঘটেছে কারণ এই সমস্ত নারীদের বিবাহে 'গোত্রান্তর' হতো না, এরা সম্ভবত রাক্ষস, গন্ধর্ব বা এই জাতীয় যে-সমস্ত বিবাহে গোত্রান্তর ঘটে না, সেই ধরনের বিবাহের মাধ্যমে এসেছিলেন।[১৬] দীনেশচন্দ্র সরকারের এই বক্তব্য অনুসরণ করে আরেকজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, মাতৃগোত্র ব্যবহার করাটা বোধহয় সেকালে 'ফ্যাশন' ছিল, পরবর্তীকালে সে ফ্যাশন উঠে যায়।[১৭] কে. গোপালাচারী বেশ বিস্তৃতভাবে বিষয়টি অনুধাবন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সাতবাহনদের মাতৃগোত্র মুখ্যত বিবাহ-বিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হতো, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না; সাতবাহন রাণীরা যে গোত্রনাম ব্যবহার করতেন, সেগুলি সাধারণত বৈদিক গোত্র, এগুলি মূলত ছিল পুরোহিতদের গোত্র, পুরোহিতদের কাছ থেকে রাজবংশগুলি সেই গোত্রনাম গ্রহণ করেছে, এবং রাজবংশের কন্যারা পিতৃগৃহের সেই গোত্রপরিচয় শ্বশুরালয়ে বহন করে এনেছেন।[১৮] তিনি বুহ্‌লারের বহুবিবাহের থিয়োরিকেও সমর্থন করেছেন। মাতৃগোত্রের ব্যবহার সংক্রান্ত যে তথ্যগুলি এতাবৎ আমাদের হাতে এসেছে, এই সমস্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তার সবটুকু যে বিশ্লেষিত হয় না, তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত, জটিল তর্কের মধ্যে না গিয়ে সাধারণ বিবেচনায়ও ধরা পড়ে যে এই সমস্ত যুক্তির মধ্যে বেশ বড়সড় ধরনের কিছু ছিদ্র রয়ে গেছে। বহুবিবাহের প্রসঙ্গটাই ধরা যাক। মেনেই নেওয়া গেল যে ঐ যুগের রাজা, মহাভোজ, মহারথী প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষেরা সবাই বহুবিবাহ করতেন। সেক্ষেত্রে অসংখ্য সৎভাইয়ের মধ্য থেকে নিজের মাতৃনামকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার একটা উপযোগিতা হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু সেটা নামকরণ এবং নামব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা রীতি হয়ে উঠতে পারে কি? বিশেষত প্রাপ্তবয়স হয়ে যাওয়ার পর রাজপদ বা সামন্তপদে পাকাপোক্তভাবে অধিষ্ঠিত অবস্থায় মাতৃনাম বহন করে যাওয়াটা শুধুমাত্র সংভাইদের থেকে পৃথকীকরণের প্রয়াস হিসাবে গণ্য করাটা একটু বেশি রকমের কষ্ট-কল্পনা বলে মনে হয় না কি? এদেশের রাজা এবং অন্য অভিজাতরা এরপরও বহু শতাব্দী ধরে বহুবিবাহের অভ্যাস অনেক ক্ষেত্রেই বজায় রেখেছিলেন, সে-সব ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবহারিক মাতৃগোত্র প্রচলিত ছিল কি? একটা বিশেষ যুগে একটা সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে মাতৃনাম বা মাতৃগোত্র ব্যবহারের ছড়াছড়ি পড়ে গেল, তারপর রীতিটা একেবারেই অবলুপ্ত হয়ে গেল, এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আরেকটু গভীরতর অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

এবারে গোত্রান্তরের প্রশ্নটাতে আসা যাক। এ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সরকারের সংক্ষিপ্ত মতামত আগে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি বাংলা আলোচনায় তিনি আরও বিস্তৃতভাবেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।[১৯] তিনি বলেছেন, সুনিয়ন্ত্রিত বিবাহব্যবস্থার অভাবহেতু সে আমলে অনেকক্ষেত্রেই বিয়ের পর নারীর গোত্রান্তর হতো না। সেই অনুসারেই নারীরা পিতৃগোত্র ব্যবহার করতেন বিয়ের পরেও। অর্থাৎ তাঁর মতে, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি নামটি থেকে বোঝা যাচ্ছে তার মাতামহ ছিলেন গৌতম গোত্রীয় বা বশিষ্ঠিপুত্র পুলোমাবীর মাতামহ ছিলেন বশিষ্ঠ গোত্রীয়। দীনেশবাবু অতি সতর্ক ঐতিহাসিক, তথ্য নিরূপণে তাঁর নিষ্ঠা এবং অনুসন্ধিৎসা অনেক সময়েই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণই অনুমানভিত্তিক, আদৌ তথ্যনির্ভর নয় বলা যায়। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির মায়ের নাম ছিল গৌতমী বলশ্রী, এ সম্পর্কে লিপিপ্রমাণ রয়েছে। কিন্তু বলশ্রীর পিতৃপরিচয় জানা যায়নি। একইভাবে ঐ সময়কার যে সমস্ত পুরুষনামের সঙ্গে মাতৃগোত্র ব্যবহৃত হয়েছে, তার কোনোটার ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট মাতাদের পিতৃনাম অথবা পিতৃগোত্র জানা যায় না। অতএব, এই সমস্ত রমণীরা শ্বশুরালয়ে আসার পরও পিতৃবংশের গোত্রই ব্যবহার করতেন, তার স্বপক্ষে সামান্যতম প্রমাণও কারোর হাতে নেই। গোটা সিদ্ধান্তই তাই নেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ধারণার বশবর্তী হয়ে।

বরঞ্চ বিপরীত সিদ্ধান্তের পক্ষে কিছু প্রমাণ খাড়া করা যায়। ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বশিষ্ঠিপুত্র চান্তমূলের বোন ছিলেন রাজকুমারী চান্তশ্রী। তিনি একটি চৈত্য নির্মাণ করিয়েছিলেন স্বামীর সহযোগিতায়, অর্থাৎ বিবাহোত্তর জীবনে।[২০] সেখানে কিন্তু তিনি 'বাশিষ্ঠিপুত্রী' অভিধাটি ব্যবহার করেছেন। রাজা চান্তমূল ও রাজভগিনী চান্তশ্রী, এ দুজনের মাতা ছিলেন 'বশিষ্ঠি', তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু ইক্ষ্বাকু রাজাদের পিতৃগোত্র নিশ্চয়ই 'বশিষ্ঠি' ছিল না, অথচ চান্তশ্রী দেখা যাচ্ছে ঐ নামটিই শ্বশুরগৃহেও ব্যবহার করেছেন। দীনেশবাবুর অনুমান সত্য হলে চান্তশ্রী ব্যবহার করতেন ইক্ষ্বাকুদের পিতৃগোত্র, কিন্তু বিবাহিতা জীবনেও তিনি ব্যবহার করছেন মাতৃগোত্র, তার বিবাহোত্তর পরিচয়ও তাই 'বশিষ্ঠিপুত্রী'।

বংশানুক্রমে মাতৃগোত্রই যে ব্যবহৃত হতো, তার আরেকটি প্রমাণও ইক্ষ্বাকু বংশতালিকায় রয়েছে। এই বংশের প্রথম রাজা বশিষ্ঠিপুত্র চান্তমূল, দ্বিতীয় মাঢ়রীপুত্র বীরপুরুষদত্ত, আর তৃতীয় রাজা বশিষ্ঠিপুত্র বাহুবল। এখন বাহুবলের মা যে ছিলেন একজন 'বশিষ্ঠিপুত্রী', তা তো তাঁর নামেই প্রকাশিত। সৌভাগ্যবশত

বাহুবলের পিতা মাঢ়রীপুত্র বীরপুরুষদত্তের চারজন রানীর মোটামুটি পরিচয় আমরা লিপি-প্রমাণে পেয়ে যাচ্ছি।[২১] একজন রানী ছিলেন শকরাজকন্যা রুদ্রধারা, বাহুবলের মাতা ইনি নন, কারণ শকরা মাতৃগোত্র ব্যবহার করত না। বীরপুরুষদত্তের অন্য তিন রানী ছিলেন তাঁরই পিসতুতো বোন। এঁদেরই একজন তাহলে বাহুবলের মাতা। তাহলে এরা বশিষ্ঠিপুত্রী অভিধাটি শ্বশুরালয় তথা মাতুলালয় পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আবার এঁদের মাও ছিলেন বশিষ্ঠিপুত্রী, কারণ তিনি ছিলেন বশিষ্ঠিপুত্র চান্তমূলের ভগিনী। তাহলে দেখা যাচ্ছে চান্তমূলের মাতা, সেই মাতার কন্যা (চান্তমূল ভগিনী), তাঁর কন্যা (বাহুবলের মাতা) এবং বাহুবল নিজে, এই চারপুরুষ ধরে মাতৃধারায় 'বশিষ্ঠি' অভিধাটি প্রবাহিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে বশিষ্ঠিপুত্রীরা সর্বদাই বশিষ্ঠি গোত্রের পুত্র বা কন্যার জন্ম দিচ্ছে, তাদের স্বামীর বা পিতার গোত্র কোথায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে না। এ বিবরণ থেকে এই ধারণাই দৃঢ়মূল হয় যে নারীরা শ্বশুরগৃহে পিতৃবংশের গোত্র ব্যবহার করত, এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, তারা সদাসর্বদা মাতৃগোত্রই বহন করত। পুরুষরাও তাই, কিন্তু তাদের গোত্র-পরিচয়ের ব্যাপারটা প্রথম পর্যায়ে ছিল প্রায় অবান্তর, কারণ অধঃস্তন পুরুষে গোত্র পরিচয় সঞ্চালিত করার অধিকার তখনও এই ধরনের মাতৃগোত্র ব্যবহারকারী পুরুষগণ কর্তৃক অর্জিত হয়নি। তারপর কিছুদিন মাতৃগোত্র ও পিতৃগোত্রের পাশাপাশি সহাবস্থান চলেছিল। সেটা ছিল পরিবর্তনমুখী একটা জটিল কাল। বাস্তব দৃষ্টান্ত সংযোগে ঐ পর্যায়টা সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

মাতৃগোত্রের ব্যবহারটা ছিল একটা ফ্যাশন—এমন কথাও বলা হয়েছে। যদি দীনেশচন্দ্র সরকার সম্পাদিত বইয়ে বক্তব্যটি স্থান না পেত, আমরা এ ধরনের বক্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করতাম না। পদবী বা গোত্রের ব্যবহার একটা ঐতিহ্যবাহী সামাজিক রীতি। ভারতীয় সমাজ-জীবনের ব্যবহারিক দিকটির সঙ্গে যাঁদের অন্তত সাধারণ পরিচয় রয়েছে, তাঁরাই জানেন যে পদবী অথবা গোত্র পরিচয়ের উপর কতখানি সামাজিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখনও গোত্রপরিচয় বর্ণহিন্দুর বিবাহক্ষেত্রে একটি ক্ষমতাশালী উপাদান। সেক্ষেত্রে দু'হাজার বছর আগে একটি অঞ্চলের অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ একটি বিশেষ ধরনের গোত্র-পরিচয় ব্যবহার করতেন শুধুমাত্র ফ্যাশনের প্রয়োজনে, কার্যকারণ সম্পর্কবর্জিত এমনতরো ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক, অশ্রদ্ধেয় ও হাস্যকর।

আসলে মাতৃগোত্র সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে, তার প্রায় পুরোটাই হয়েছে পুরুষপ্রধান সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে। এর ফলে, কার্ল মার্ক্স

যাকে বলেছেন judicial blindness, সেই জাতীয় অন্ধতাই এ সম্পর্কে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। নইলে এত ব্যাপকভাবে গন্ধর্ব-বিবাহ সংঘটন সম্ভবপর ছিল কিনা, এ নিয়ে দীনেশবাবু নিজেই সংশয় প্রকাশ করেছেন[২২]—কিন্তু তারপরই কল্পিত এবং সম্পূর্ণ আনুমানিক যুক্তি প্রয়োগ করে সেই সংশয় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি গোটা সমস্যাটাকেই দেখেছেন বিবাহিতা নারীর গোত্রান্তর হতো কিনা, এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি তাই সিদ্ধান্ত খাড়া করেছেন মনুসংহিতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। তিনি মন্তব্য করেছেন, "বর্তমান কালের ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত বিবাহ-ব্যবস্থা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।"[২৩] অথচ তাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগল না যে, যে সাতবাহন রাজারা জাতি-সাঙ্কর্য বন্ধ করেছেন বলে দাবি করেছেন, যাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলছেন, যাঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন, তাঁরা নিজেদের প্রজাদের মধ্যে না হোক, রাজপরিবার এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের বিবাহ ব্যবস্থাটাকে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত রেখে দেবেন, এটা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২৪] প্রশ্নটা যে আদৌ সুনিয়ন্ত্রিত বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র সামাজিক পদ্ধতির সঙ্গে, এ কথাটা তিনি বা তাঁর সমমতাবলম্বীরা কেউ বিবেচনাই করেন নি। গোপালাচারী অবশ্য দিকে আদিম সমাজে যে এখনও মাতৃগোত্র প্রচলিত সে কথাটা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তারপরই আবার প্রচলিত ধারণাটিকেই আশ্রয় করেছেন, আদিম সমাজের উত্তরণ প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টাই করেননি।[২৫] একটা সামাজিক রীতির উদ্ভব যে সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গেই জড়িত থাকা সম্ভব, এ মৌল কথাটা ভুলে গিয়েই যাবতীয় অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। ফলে ধানের খেতে বেগুন খোঁজাই সার হয়েছে।

৩

পণ্ডিতগণ এই বিভ্রান্তির দরুন কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথাযথভাবে ব্যবহারই করা হয়নি। এ-যুগের শিলালিপি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সাধারণভাবেই পিতৃনাম ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত অনেক কম। আবার মাতৃগোত্রধারীরা যেখানে পিতৃনাম ব্যবহার করেছেন, সেখানেও পিতৃনামের সঙ্গে মাতৃগোত্রই ব্যবহার করেছেন, পিতৃ-গোত্র নয়।[২৬] কার্লে গুহার একটি লিপিতে পাচ্ছি বশিষ্ঠিপুত্র সোমদেবের পিতার নাম ছিল কৌশিকীপুত্র মিত্রদেব। আর ভারহুত গুহায় পাচ্ছি বাচী (বাৎসী) পুত্র ধনভূতির পিতা গোতিপুত্র (কৌৎসী) অগরাজ এবং তার পিতা হচ্ছেন

গার্গীপুত্র বিষদেব।[২৭] নারীরা অনেকক্ষেত্রেই আবার মায়ের ব্যবহারিক নাম উল্লেখ করেছেন, সহোদর ভ্রাতা ভগিনীর নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পিতার নাম উল্লেখ করেননি।[২৮] আগে উল্লিখিত দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া এ-যুগের কোনো মাতৃ-গোত্রধারী সামন্তের পিতৃপরিচয় আমরা লিপিগুলিতে পাইনি।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য, মাতৃগোত্রধারী (অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের) সাতবাহন রাজারা পর্যন্ত কেউ-ই তাঁদের লিপিতে পিতৃপরিচয় দেননি। গৌতমী বলশ্রীও উল্লেখ করেননি তাঁর স্বামীর নাম।[২৯] বাশিষ্ঠিপুত্র পুলোমায়ী একটি লিপিতে পিতার উল্লেখ (পিতুপতিয়) করেছেন মাত্র, কিন্তু তার নাম দেননি। এ তথ্যটা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিছুটা বিস্ময়করও বটে। সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায় যে সমস্ত লিপিপ্রমাণ রেখে গেছেন, তাতে পিতৃনাম এবং পিতৃবংশের বিস্তর উল্লেখ চোখে পড়ে। মূলত পিতৃপরিচয়ের ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ সচেতনতা ছিল, যে সচেতনতা আজকের ভারতীয় সমাজেও বহমান। কিন্তু সাতবাহন যুগে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে, বিশেষ করে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ সচেতনতার বিলক্ষণ অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই একটা বিশেষ ধরনের সামাজিক মানসিকতার প্রতিফলন এবং সে মানসিকতার পশ্চাৎপটে যে ধরনের সমাজ সংগঠন সক্রিয় থাকে, তার সঙ্গে পরিপূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের কিছুটা পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। মাতৃগোত্রকে জাহির করা এবং পিতৃপরিচয় সম্পর্কে নীরব থাকা শুধুমাত্র সেই ধরনের সমাজেরই সাধারণ লক্ষণ হতে পারে, যে সমাজে ঐতিহ্যগত কারণে পিতার চাইতে মাতার সামাজিক গুরুত্ব সমধিক। এই মৌলিক সত্যটি মেনে নিলে সাতবাহন যুগের মাতৃগোত্র ব্যবহারের রহস্যটা অনেক পরিষ্কার হয়ে যায়।

আমরা এমন কথা বলছি না যে ঐ যুগে পরিপূর্ণ মাতৃতান্ত্রিকতাই চালু ছিল, কিংবা উত্তরাধিকার মাতৃধারায় প্রবাহিত হতো। সমসাময়িক লিপিমালায় যে-সমস্ত তথ্য বিধৃত, তাতে বোঝা যায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পিতৃধারার প্রাধান্য তখন ঐ সমস্ত অঞ্চলে মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পিতৃপ্রাধান্যের আদর্শটা সেখানে ছিল আগন্তুক, ঐতিহ্যগত আদর্শটা ছিল মাতৃপ্রাধান্যের। নতুন আগন্তুক আদর্শের সঙ্গে ছিল সহযোগী অর্থনীতির সহায়তা, তবুও যার শিকড় ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত, সে অত সহজে তার নিজস্ব জমিটুকু ছেড়ে দেয় না। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরুষপ্রাধান্য স্থাপিত হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে মাতৃপ্রাধান্য

আরও কিছুদিন টি঳কেছিল। এমনকী অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মাতৃপ্রাধান্যের কিছু কিছু অবশেষও যে এ-যুগে বজায় ছিল, তার প্রমাণও রয়েছে।

ঐতিহাসিকরা এগুলি নিয়ে কিছুটা আলোচনাও করেছেন, যদিও এগুলির সঙ্গে মাতৃগোত্র ব্যবহারের সংশ্রব থাকা সম্ভবপর ছিল কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখেননি। সাধারণভাবে নারীর মর্যাদা সাতবাহন যুগে কিছুটা বেশি ছিল, এই শিক্ষাই তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন। নাসিক, অমরাবতী ও অন্যান্য জায়গায় যে বৌদ্ধমঠগুলি ছিল, তাতে অনেকগুলি দানলিপি উৎকীর্ণ হয়েছে। নাসিকে ২৯টির মধ্যে ১৬টি, অমরাবতীতে ১৪৫টির মধ্যে ৭২টি এবং কুডাতে ৩০টির মধ্যে ১৩টি ক্ষেত্রে মহিলারাই দান করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে দানের পরিমাণ রীতিমতো উল্লেখযোগ্য।[৩০] দানকার্যে নারীদের এত ব্যাপক অংশগ্রহণ অন্যত্র এবং অন্য যুগে দৃষ্টিগোচর হয় না। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে সে যুগের মহিলারা বড়োই ধর্মপরায়ণ ও দানশীলা ছিলেন। তা তো ছিলেনই, কিন্তু ঐ সমস্ত বিশুদ্ধ মন্তব্যের প্রতি কটাক্ষ না করেও বলা যায় যে দানশীলতা ছাড়াও এগুলি নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রমাণও দিচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নারীদের নিজস্ব সম্পদ ছিল এবং তার উপর তাঁদের কর্তৃত্বও ছিল। এ-সম্পদ আংশিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল কিনা, তা জানার মতো তথ্য অবশ্য আমাদের হাতে নেই। নারীর যেটুকু অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির আভাস আমরা এ তথ্য থেকে পাচ্ছি, তা নিশ্চয়ই আধুনিক কেতায় নারীমুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত ছিল না, সে অধিকারটুকু টি঳কেছিল আদি মাতৃতান্ত্রিক রীতির অবশেষ হিসাবে।

অমরাবতী মঠের দেয়ালে একটা কৌতূহলপ্রদ চিত্র রয়েছে। দুজন রাজপুরুষের মধ্যে কথা হচ্ছে এবং তাকে ঘিরে রেখেছেন একটি নারীবাহিনী। তাঁদের কারোর ভঙ্গিতে উত্তেজনা, কারোর বা কৌতূহল পরিস্ফুট। প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা চিত্রকলায় নারীরা সাধারণত দেবী, অপ্সরা, নর্তকী অথবা প্রতিহারিণী হিসাবেই উপস্থাপিত। আলোচ্য চিত্রের নারীরা কিন্তু সাধারণ গৃহিণী শ্রেণীর, বড়োজোর রাজপরিচারিকা। প্রকাশ্য আলোচনায় তাঁদের এই অংশগ্রহণ সাতবাহনযুগের সামাজিক আবহেরই প্রতিফলন। আরেকটি ছোট্ট তথ্যও উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি লিপিতে মহারথিনী[৩১], মহাসেনাপতিনী[৩২] এই অভিধা মহিলাদের নামের আগে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও এঁরা সত্যিই রাজকর্মচারী ছিলেন না, অভিধাগুলো তাঁরা লাভ করেছিলেন স্বামীর কর্মসূত্রে, তবুও মহারাণীর মতো

সাতকণীরাও যে সম্মানজনক অভিধা ব্যবহারের সুযোগ পেতেন, এটা নারীদের বাড়তি সম্মানের ইঙ্গিত দিচ্ছে। পরবর্তীকালের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ রীতি আর চালু ছিল না।

আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে নাসিকের একটি শিলালিপিতে। গৌতমী-পুত্র সাতকরণির মাতা গৌতমী বলশ্রীর আদেশে রচিত একটা দানলিপিতে দেখা যাচ্ছে যে রাজমাতার প্রধানা পরিচারিকা দানপত্রটি অনুমোদন করছেন এবং লিপিটি খোদাইও করেছেন পুজিতি নাম্নী একজন পরিচারিকা।[৩৩] বৈষয়িক তথা প্রশাসনিক কাজকর্মে নারীদের এই ধরনের সরাসরি অংশগ্রহণের ইঙ্গিতটিও তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষ করার বিষয় গৌতমী বলশ্রী নিজেকে সাতকরণির মাতা বলে দাবি করেছেন কিন্তু স্বামীপরিচয় প্রদান করেননি। পুত্র বা কন্যার পরিচয়ে মাতার পরিচয় প্রদানের বহু দৃষ্টান্ত এ-যুগে পাওয়া যাচ্ছে। সে তুলনায় পিতৃ বা স্বামী পরিচয়ের সংখ্যা অনুল্লেখ্য।[৩৪]

একটি বিবরণে পাচ্ছি—নারী তীর্থযাত্রায় গেছেন, সঙ্গে তাঁর পিতা, স্বামী, মাতা, পুত্র, কন্যা; এমনকি বোনঝি পর্যন্ত। অনুমান করা হয়েছে কোনো নারীর পিত্রালয়ে গমনের সময়ই সম্ভবত এই তীর্থযাত্রাটি সংঘটিত হয়েছিল।[৩৫] এর চাইতে কিন্তু অনেক বেশি সম্ভাব্য যে নারীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বশুরালয়ে যেতেন না, স্বামীরাই আসতেন পত্নীগৃহে। দক্ষিণ ভারতে এই রীতি এখনও বহু ক্ষেত্রে প্রচলিত। Matrilocal এই বিবাহ-ব্যবস্থা মাতৃপ্রধান সমাজেরই একটি বিশেষ রীতি। সাতবাহন আমলে মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও সম্ভবত এই রীতির অবশেষ টিঁকেছিল।

নানাঘাট গুহার একটি লিপিতে রানী নাগানিকা দাবি করছেন যে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। সেই যজ্ঞের বিবরণও দেওয়া হয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ কোনো নারীদ্বারা অনুষ্ঠিত হতে পারে কিনা, এ নিয়ে ডি. আর. ভাণ্ডারকার, বুহ্‌লার প্রভৃতি পণ্ডিতজন বিস্তর তর্ক উত্থাপন করেছেন।[৩৬] সে বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায় যে কোনো নারী যখন প্রকাশ্যে এ-ধরনের দাবি উপস্থাপন করেন, তখন তাঁর পিছনে একধরনের সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন থাকে। অতএব তার কাজ শাস্ত্রীয় হয়েছিল কিনা, স্বামী সহযোগে যজ্ঞটি করেছিলেন কিনা, এ সমস্ত তর্কের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে তাঁর এই ঘোষণার মধ্যে নিশ্চয়ই লোকাচার ও দেশাচার বিরোধী কিছু ছিল না, থাকলে এমন লিপি উৎকীর্ণ হতো না।

অপর একটি তথ্যেরও উল্লেখ করা দরকার। এ-যুগের কিছু দানলিপিতে দাতা

প্রকাশ্যেই নিজেকে বেশ্যাপুত্র বা গণিকাকন্যা বলে ঘোষণা করেছেন। সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে হানিকর বিবেচিত হলে এমনতরো ঘোষণা নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ হতো না। পূজারিণী নারী যখন সামাজিক নেত্রী এবং ধর্মীয় প্রধানা ছিলেন, সে যুগে বহুচারিতা যে তাঁদের পুণ্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হতো, সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। মাতৃপ্রাধান্যের সঙ্গে পূজারিণীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এবং ডি. ডি. কোসাম্বী দেখিয়েছেন যে এই সমস্ত পূজারিণীরাই পরে পুরুষ-প্রধান সমাজে গণিকা হিসাবে সম্ভোগ এবং ঘৃণার পাত্রী হয়ে দাঁড়ায়।[৩৭]

এই যে সামাজিক পটভূমি, যেখানে নারীসমাজের আচার-আচরণের স্বাধীনতা অনেকখানিই স্বীকৃত, তার সঙ্গে পরবর্তী ভারতীয় সমাজের চিত্রটি ঠিক মেলে না, মেলে না পরবর্তী সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও। আসলে এটা ছিল একটা যুগসন্ধির সময়, দুটো ধারার মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। মাতৃগোত্রের ব্যবহারই যে একচেটিয়া ছিল, তাও তো নয়। বণিক এবং কৃষকরা কেউই বড়ো-একটা মাতৃ-গোত্র ব্যবহার করেননি, কেউ কেউ পিতৃপরিচয়ও দিয়েছেন। শক ও যবনরাও মাতৃগোত্রের অনুসারী ছিলেন না। সাতবাহন রাজাদের মধ্যেও দুটো ধারাই পাচ্ছি। সিমুককে যদি সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধরি, তবে তিনি এবং তাঁর পরবর্তী দুজন রাজা, প্রথম সাতকর্ণি এবং কৃষ্ণ, মাতৃগোত্র ব্যবহার করেননি। উত্তরাধিকারটাও ঠিক কোন ধারায় চলত তা-ও সুস্পষ্টভাবে বোঝার উপায় নেই। প্রথম সাতকর্ণির লিপিতে সিমুকের উল্লেখ আছে, কিন্তু পিতা হিসাবে উল্লিখিত হয়নি। লিপিতে কিন্তু তাঁর রানী নাগনিকার পিতার নাম রয়েছে। রানী নাগনিকার পুত্রদের নাম লিপিতে রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে আবার পরবর্তী রাজা কৃষ্ণের উল্লেখ নেই। ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী তাই বলেছেন যে সাতবাহনদের উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি বড়ো গোলমেলে।[৩৮] যাই হোক, সিমুক থেকে কৃষ্ণ পর্যন্ত আমরা মাতৃগোত্রের উল্লেখ পাচ্ছি না। মধ্যবর্তী পর্যায়ের বেশ ক'জন রাজার নামই আমরা জানি না।[৩৯] ফলে এ রাজবংশে মাতৃগোত্রের ব্যবহার যে কোন রাজার আমলে শুরু হলো তাও বলা কঠিন। কে. গোপালাচারী অনুমান করেছেন যে স্থানীয় প্রভাবশালী কোনো বংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সাতবাহনরা এই রীতিটি অর্জন করে থাকতে পারেন।[৪০]

প্রথম সাতকর্ণির স্ত্রী নাগনিকার যে উল্লেখ পাচ্ছি, তার সঙ্গে এই প্রথার সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। কোসাম্বী দেখিয়েছেন যে সমকালীন বিভিন্ন উপজাতিকে সাধারণভাবে নাগ বলে অভিহিত করা হতো[৪১] এবং এঁদের সামাজিক সংগঠন

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল মাতৃপ্রধান।[৪২] নাগনিকা নামটি যে নাগবংশীয় কন্যার নাম হিসাবেই এসেছে, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকরা প্রায় নিঃসন্দেহ।[৪৩]

নাগবংশীয়দের আরও কিছু উল্লেখ এ-যুগের প্রত্নলিপির মধ্যে রয়েছে।[৪৪] তবুও সাতবাহনদের মাতৃগোত্র ব্যবহারের রীতির উদ্ভবের সঙ্গে নাগবংশীয়দের সংস্রবের ব্যাপারটা অনুমানের পর্যায়েই রেখে দেওয়া ভালো, আরও নির্দিষ্ট তথ্য ব্যতীত সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন নয়। তবে বিবাহসূত্রে মাতৃগোত্র প্রাপ্তির একটা দৃষ্টান্ত আমাদের হাতে রয়েছে। আভীর রাজা ঈশ্বর সেন নিজেকে মাঢ়রীপুত্র বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু তাঁর পিতা মাতৃগোত্র বর্জিত শুধুই শিবদত্ত।[৪৫] আভীর-দের বহিরাগত উপজাতি বলা হয়,[৪৬] এবং তাঁরা মাতৃগোত্র ব্যবহার করতেন না। শিবদত্তের নামের আগে কোনো রাজমর্যাদাসূচক পদবীও ব্যবহৃত হয়নি, তাতে মনে হয় ঈশ্বর সেন মাতৃসূত্রেই রাজত্বলাভ করেছিলেন। এমনও হতে পারে যে নাগনিকার আমলে নয়, তার পরের পর্যায়ে, শকদের আক্রমণে বিপর্যস্ত ও হৃতরাজ্য সাতবাহনরা হয়তো স্থানীয় কোনো প্রভাবশালী মাতৃগোত্রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনের সূত্রে পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

যাই হোক, মূল ব্যাপার দাঁড়ালো—প্রথম তিনজন সাতবাহন রাজা মাতৃগোত্র ব্যবহার করতেন না, তারপর একটা অস্পষ্ট অধ্যায়, এবং এরপর গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি থেকে সাতবাহনরা ধারাবাহিকভাবে মাতৃগোত্র ব্যবহার করে গেছেন। অর্থাৎ সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক আদর্শের ক্ষেত্রে একটা অস্থির অবস্থা চলেছে। পুরনো আদর্শের ভিত্তি টলে গেছে, কিন্তু তা তখনও সমূলে উৎপাটিত নয়, আবার নতুন আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, কিন্তু তার ভিত্তিও দৃঢ়মূল হয়নি। সামাজিক ক্ষেত্রে মাতৃপ্রাধান্য ও পিতৃপ্রাধান্যের এই যে সংঘাত, দ্বন্দ্ব এবং সহাবস্থান—ও তার সামান্য পরবর্তী যুগের লিপিমালায় তারই ইঙ্গিতগুলি বিধৃত।

৪

উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনে যখন পর্যাপ্ত উদ্‌বৃত্তের সৃষ্টি হয়, ব্যক্তিগত মালিকানা, পিতৃপ্রাধান্য, পুত্রের উত্তরাধিকার ইত্যাদি ধারণাগুলো তখন তারই অনুষঙ্গ হিসাবে অনিবার্যভাবে আসে। সাতবাহন যুগের কিছু আগেই অনুরূপ আর্থ-সামাজিক আবহ যে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে তৈরি হয়েছিল, সে আলোচনা আমরা পরে করব। বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্যটি হচ্ছে, অর্থ নৈতিক আবহের আনুকূল্যে যদি পিতৃ-প্রাধান্যের আদর্শটি সামাজিক ক্ষেত্রে একবার অনুপ্রবিষ্ট হয়, তবে শেষ পর্যন্ত তার

চূড়ান্ত জয় ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মাতৃগোত্র বা সমজাতীয় আদর্শ ঐতিহ্যের জোরে কিছুদিন লড়াই চালিয়ে যায় সত্যি, কিন্তু অনড় এই লড়াইয়ে তার পরাজয় শুধুমাত্র কিছু সময়ের ব্যাপার মাত্র। সমাজতত্ত্ববিদ হিসাবে স্যার জেমস ফ্রেজারের অনেক সিদ্ধান্তই আজ অকেজো বলে ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু তার নিম্নোক্ত বক্তব্য এখনও সঠিক :

"Whereas the system of father kin once established is perfectly stable and never exchanged for mother kin, the system of mother kin on the other hand is unstable being constantly liable to be exchanged for father kin."[৪৭]

সাতবাহন ইক্ষ্বাকুদের পরে মাতৃগোত্র ব্যবহারের রীতিটি যে রাতারাতি নির্বাসিত হয়েছিল, তা নয়। বিচ্ছিন্নভাবে তার দুর্বল অস্তিত্বের পরিচয় এরপরও পাওয়া যায়। বাকাটক বংশীয় প্রথম রাজা বিন্ধ্যশক্তি নিজেকে বলেছেন হারীতী-পুত্র। এই বংশের আর কোনো রাজা এই ধরনের পরিচয় বহন করেননি, কিন্তু একজন যুবরাজ পাওয়া যাচ্ছে যিনি ছিলেন গৌতমীপুত্র।[৪৮] চুত, কদম্ব এবং চালুক্য বংশীয় রাজারা নামের আগে মাতৃগোত্র ব্যবহার করেননি, কিন্তু একজন আদিমাতা থেকে নিজেদের উদ্ভব ঘোষণা করার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের বংশ পরিচয় দিয়েছেন হারীতীপুত্র বলে। অর্থাৎ তাঁরা ব্যক্তিগত মাতৃগোত্রের বদলে পারিবারিক মাতৃগোত্রের প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার পাশাপাশি পিতৃ-গোত্র ব্যবহারের প্রবণতাও তখন ক্রমবর্ধমান। সাতবাহন যুগের অন্তত একটি লিপিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি এবং বশিষ্ঠিপুত্র পুলোমায়ীর উপর পিতৃগোত্রও আরোপ করা হয়েছে।[৪৯] তাঁদের পিতৃগোত্র বলা হয়েছে 'বৃহৎফল'। শকজয়ণ রুদ্রপুরুষদত্ত নিজেকে 'বৃহৎফলায়ন' গোত্রের সন্তান বলেছেন, পরবর্তী আরেকজন রাজা জয়বর্মণও 'বৃহৎফলায়ন'।[৫০] জয়বর্মণকে পরাজিত করেন যে রাজবংশ তাদের গোত্র ছিল শালঙ্কায়ন।[৫১] চালুক্য ও কদম্বরা একদিকে হারীতীপুত্র, অপরদিকে তাঁদের পিতৃগোত্র হচ্ছে 'মানব্য'।[৫২]

বাকাটকদের পিতৃগোত্র ছিল বিষ্ণুবৃদ্ধ, সম্ভবত তাঁদেরই জ্ঞাতি বিষ্ণুকুণ্ডিনরাও রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। আরেকটি রাজবংশ পাচ্ছি যাঁরা নিজেদের বলছেন 'আনন্দ গোত্রীয়'।[৫৩] এগুলি সবই দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের রাজবংশ, সাতবাহন-ইক্ষ্বাকুদের অনতিপরে এরা রাজত্ব করেছেন। দেখা যাচ্ছে বিচ্ছিন্নভাবে মাতৃ-গোত্রকে টিঁকিয়ে রাখার প্রয়াস সত্ত্বেও পিতৃগোত্রই আসন নিয়ে নিচ্ছে, মাতৃ-

গোত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর সম্ভব হয়নি। ফ্রেজারের সূত্র অনুসারে এটাই অনিবার্য ছিল।

পিতৃগোত্র হিসাবে যে নামগুলো পাচ্ছি, সে সম্পর্কেও একটু আলোচনা করা দরকার। এর মধ্যে দুটো নামের সঙ্গে কিছুটা বৈদিক সংযোগ রয়েছে। শালঙ্কায়ন একজন বৈদিক ঋষি, প্রচলিত গোত্র তালিকায় অবশ্য তিনি গোত্র-প্রতিষ্ঠাতা নন, তবে প্রবরের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। বিষ্ণুবৃদ্ধ বা বিষ্ণুবৃদ্ধিও কোনো স্বীকৃত গোত্র নয়, তবে বিষ্ণুবৃদ্ধকে ভরদ্বাজগোত্রের শাখা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪] বৃহৎফলায়ন, আনন্দ বা মানব্য কিন্তু কোনো স্বীকৃত গোত্র তালিকায় উল্লিখিত নয়। বোঝা যাচ্ছে, পিতৃগোত্রের আদর্শটা হয়তো বেদপ্রভাবিত উত্তর ভারত থেকেই এসেছে, কিন্তু গোত্রনাম ধারণ করার সময় বৈদিক আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। গোত্র প্রতিষ্ঠাতাকে বংশের আদিপুরুষ হিসাবে গণ্য করার যে ধারণা পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, এই গোত্রনামগুলি সবক্ষেত্রে তার প্রতিও মনোযোগী নয়। মনে হয় উপজাতীয় যে সমস্ত গোষ্ঠী নতুন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদর্শকে গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সম্ভবত নিজস্ব কোনো সামাজিক অভিজ্ঞানকে (যেমন টোটেম, লৌকিক আদিপিতা অথবা আদিমাতার পুরুষ রূপান্তর) সামান্য পরিবর্তিত ও সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করে গ্রহণ করেছিলেন।

আরেকটি তথ্যও লক্ষণীয়। এই সময়কার দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয় প্রায় সবগুলি রাজবংশই নিজেদের ব্রাহ্মণ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। মৌর্য পরবর্তী উত্তর ভারতীয় রাজবংশ সুঙ্গ এবং কাহ্নরাও নিজেদের ব্রাহ্মণ বলেছেন। সাধারণত বলা হয় যে মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি এবং হিন্দুধর্মের গৌরবহানি ব্রাহ্মণদের অস্ত্র ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৫৫] যুক্তিটি খুব জোরালো বলে মনে হয় না। সুঙ্গদের বৌদ্ধ বিদ্বেষ সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে আর দক্ষিণ-পশ্চিমি এই সমস্ত রাজবংশের অনেকেই বৌদ্ধধর্মের রীতিমতো পোষকতা করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, পরবর্তী যুগের হিন্দু রাজারা যখন নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণের জন্য উৎসাহ দেখিয়েছেন, সেক্ষেত্রে এঁদের ব্রাহ্মণত্বের দাবির পেছনে কোন বিশিষ্ট তাগিদটি কাজ করেছিল?

একটি অনুমান সম্ভাব্য বলে মনে হয়। বৈদিকধর্মের সঙ্গে প্রাক্‌বৈদিক ধর্মাচারের সংমিশ্রণে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম জন্ম নিয়েছিল, বহু আদিবাসী গোষ্ঠীকে তা আকৃষ্ট করেছিল।[৫৬] এই গোষ্ঠীগুলির অনেকেই আদি পর্যায়ে ছিল মাতৃতান্ত্রিক

এবং পরবর্তী বিবর্তনে একধরনের পুরোহিত-শাসক (priest-king) এই ধরনের অনেক গোষ্ঠীকেই পরিচালনা করতেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার সময় এঁরা যে ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা পেতেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ কম।[৫৭] সেই সঙ্গে শাসক হিসাবে তাঁদের রাজপরিচয়ও ছিল স্বীকৃত। বাংলার সেনবংশীয় রাজারা ছিলেন দক্ষিণ ভারতাগত, তাঁরা যে নিজেদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলতেন, তার মধ্যেও সম্ভবত এই সত্যটি নিহিত রয়েছে। খুবই সম্ভাব্য যে দাক্ষিণাত্যের এই সমস্ত ব্রাহ্মণ শাসকদের সঙ্গে উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় বা নব্যক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির একটা সংঘাতের সম্পর্ক বর্তমান ছিল। তাই গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি দাবি করেছেন যে তিনি ক্ষত্রিয়দের গর্বহানি ঘটিয়েছেন।[৫৮] বিশ্বামিত্র বনাম বশিষ্ঠের সংঘাত বা পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনের কাহিনীর পটভূমি এই ধরনের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হওয়া বিচিত্র নয়। মাতৃগোত্রের অবলুপ্তি এবং পিতৃগোত্রের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী পর্যায়টাতে একটি সামাজিক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তার স্বরূপটি আজকে আর নির্ণয় করা সম্ভব নয়: বড়ো রকমের কোনো সংঘাতের ইঙ্গিত সংশ্লিষ্ট সময়ের রাজকীয় লিপিমালার মধ্যেও নেই। কিন্তু ছোট্ট অথচ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি স্মারক রয়েছে, যার তাৎপর্য, কেন জানি না, পণ্ডিত সমাজে আলোচিত হয়নি। লিপিমালায় দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের বৃহৎফলায়ন, পল্লব এবং শালঙ্কায়ন বংশের রাজারা নিজেদের বলছেন 'পিতৃভক্ত'।[৫৯] উড়িষ্যার বর্মণ রাজারা এবং গঙ্গবংশীয়রাও[৬০] নিজেদের সম্পর্কে 'পিতৃভক্ত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

এখানে ঐ 'পিতৃভক্ত' শব্দের ব্যবহার তথ্য হিসাবে নিশ্চয় খুব উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে অনেক রাজকীয় লিপিতেই পিতৃপুরুষের বিপুল গৌরবমহিমা কীর্তিত হয়েছে, কিন্তু তাঁরা কখনও নিজেদের 'পিতৃভক্ত' বলে জাহির করা প্রয়োজন মনে করেননি। দক্ষিণ ভারতে ঐ বিশেষ কালপর্যায়ে দেখা যাচ্ছে, সে প্রয়োজন কেউ কেউ অনুভব করেছেন। কালপর্যায়টাও লক্ষ করার মতো। অনতিপূর্বে সাতবাহনরা ব্যবহার করেছেন মাতৃগোত্র, পিতৃপরিচয়টুকু পর্যন্ত তাঁরা দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি। তারপরে একদল রাজা ধারাবাহিক ভাবে পিতৃপরিচয় দিয়ে গেছেন, কিন্তু কেউ কেউ সেই সঙ্গে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত মাতৃগোত্র বজায় রাখতেও চেষ্টিত ছিলেন। তারই সমসাময়িক বা সামান্য পরবর্তী একদল রাজবংশ দেখা যাচ্ছে মাতৃপরিচয় একেবারেই বর্জন করেছেন এবং নিজেদের ঘোষণা করেছেন 'পিতৃভক্ত' বলে। এই ঘোষণার প্রয়োজন কেন পড়ল? নিশ্চয়ই বিপরীত দিকে

আরেকদল ছিলেন, যাঁরা ছিলেন 'মাতৃভক্ত'। এঁরা কারা তা-ও আমরা ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকেই আগে চিহ্নিত করেছি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বিপরীত দিকে একদল 'মাতৃভক্ত' প্রাচীন সামাজিক আবহের কিছুটা অবশেষ টিঁকিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন বলেই নবাঙ্কিত পিতৃপ্রধান সামাজিক আদর্শের সমর্থকরা পিতৃ-ভক্তির প্রকাণ্ড পরাকাষ্ঠা দেখাতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সমাজদেহে পিতৃ-প্রাধান্যের ধারণাটা যখন পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন এই ধরনের ঘোষণা বাহুল্যমাত্র। এর একটা প্রাসঙ্গিকতা তখনই ছিল যখন 'পিতৃভক্তি' সমাজের সর্বত্র সমানভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। মাতৃপ্রধান সমাজ-সংগঠনের বস্তুভিত্তি আগেই অপসৃত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে তার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবশেষ টিঁকেছিল ঐতিহ্যপ্রেমকে সম্বল করে: সেই অবশেষগুলোকে সম্পূর্ণ উৎসাদন করার জন্য নতুন সামাজিক নেতৃত্ব যে উদ্যোগ নিয়েছিল, 'পিতৃভক্ত' এই সমস্ত রাজবংশ হচ্ছে তাঁদেরই অত্যুৎসাহী প্রতিভূ। যে ভৌগোলিক এলাকায় নামের আগে মাতৃগোত্র ব্যবহার করা হতো, এখন সেই এলাকাতেই যে নামের মধ্যে প্রায় বাধ্যতামূলক পিতৃনাম ব্যবহার করা হয়, সেটাও হয়তো এই 'পিতৃভক্তি'রই বহিঃপ্রকাশ।

৫

আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে মাতৃপ্রধান সমাজ বিবর্তন-প্রক্রিয়ার অনিবার্য অভিঘাতে যখন পিতৃপ্রাধান্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন অন্তর্বর্তীকালীন কতকগুলি চরিত্রলক্ষণ সমাজদেহে প্রকটিত হওয়াটাই সম্ভাব্য। সাতবাহনযুগে সেই ধরনের লক্ষণগুলি বর্তমান ছিল এবং তারই ভিত্তিতে ঐ যুগটিকে একটি অন্তর্বর্তী পর্যায়রূপে বিবেচনা করা যায় বলেই আমাদের ধারণা। তথ্যের বিচারে এ-ধারণা যে একেবারে নিরঙ্কুশ, এমন দাবি করা চলে না, কিন্তু যে কোনো নিরপেক্ষ বিচারেই স্বীকৃত হবে যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিপরীত কিংবা অন্যতর কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আরও দুরূহ। ঐ যুগের লিপিবিধৃত তথ্যগুলি নিয়ে একটি পরিণত পিতৃপ্রধান শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মণ্যসমাজের অবয়ব তৈরি করতে গেলে যে-ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করেছি। তবুও তথ্যের অপ্রতুলতার ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং তাই অন্য একটি পদ্ধতির সাহায্যেও সমস্যাটিকে পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা আমরা করেছি। এখানে সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

ঋগ্বেদের যুগের আর্যরা সামাজিক বিবর্তনের যে পর্যায়টাতে ছিলেন, তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্য পণ্ডিতরা আধুনিক আফ্রিকার নিগ্রো এবং কাফির জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। কারণ আদিতে পশুপালক আর্যরা কৃষিকাজ এবং লৌহ ব্যবহারের ব্যাপার-স্যাপারগুলো কিছু পরিমাণ আয়ত্ত করার পরই যে ঋগ্বেদ রচনা করেছিলেন, তার কিছুটা অভ্যন্তরীণ প্রমাণ বর্তমান। উনবিংশ শতাব্দীর দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো ও কাফিররা বিবর্তনের ঠিক ঐ পর্যায়টাতেই ছিলেন। দেখা গেছে, এই পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালানোর ফলে ঋগ্বেদের বহু অংশের উপলব্ধি সহজতর হয়েছে।[৬১] উত্তরপূর্বাঞ্চলের খ্যাত-অখ্যাত বহু উপজাতির মধ্যে মাতৃপ্রাধান্যের বিভিন্ন পর্যায় এখনও লক্ষ করা যায়। এঁদের সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে সাতবাহনযুগের সামাজিক পরিস্থিতিটার অন্তত কিয়দংশও বোঝা যায় কিনা, সে প্রয়াস আমরা করতে চেয়েছি। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাতবাহন যুগের দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত যে-পর্যায়টাতে ছিল তার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ তুলনা করা যায় এমন কোনো উপজাতীয় অঞ্চল উত্তর-পূর্ব ভারতে নেই। অতএব সার্বিক সাদৃশ্যের অনুসন্ধানও আমরা করিনি, আমাদের লক্ষ্য ছিল একান্তই সীমাবদ্ধ। মাতৃপ্রাধান্যের আবহ থেকে পিতৃপ্রাধান্যের দিকে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে এমন কোনো উপজাতির সামাজিক রীতিনীতির স্বরূপটি আমাদের সমস্যাটির উপলব্ধিতে কোনো সাহায্যে আসে কিনা, সেটুকুই আমাদের অনুসন্ধানের উপজীব্য ছিল। এই ব্যাপারে আমরা উত্তর-কাছাড় জেলার ডিমাসা কাছাড়ী উপজাতিকে বেছে নিয়েছিলুম, কারণ এরাই পিতৃতন্ত্রে উত্তরণের একেবারে শেষ পর্যায়ে পা রেখেছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধর্মে হিন্দু, যদিও সামাজিক সংগঠনে উপজাতীয় উপাদান এখনও অনেকখানি বর্তমান।

নারীপুরুষ নির্বিশেষে ডিমাসারা বর্তমানে তাঁদের পিতৃপদবীই ব্যবহার করেন। কিন্তু এটা তাঁদের বহিরঙ্গের পরিচয়মাত্র। তাঁদের সমাজ-সংগঠন মাতৃপ্রাধান্য ও পিতৃপ্রাধান্যের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। ডিমাসা নারী ও পুরুষেরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোত্রপরিচয় বহন করেন; যদিও ধর্মে হিন্দু, কিন্তু গোত্রনামের ব্যাপারে তাঁরা প্রাচীন উপজাতীয় নামই ব্যবহার করেন, প্রচলিত হিন্দু গোত্রনাম নয়। যেমন পুরুষগোত্রের নাম হচ্ছে হাফ্রামছা, নাবেনছা, গন্দছা ইত্যাদি; নারীদের গোত্রনাম হচ্ছে ঠাইদ্‌দি, বেরাভি, মাইরংদি ইত্যাদি। ডিমাসা নারীরা ৪২টি গোত্রে বিভক্ত, নারীগোত্রের স্থানীয় নাম হচ্ছে জুলু বা জাড়ি। পুরুষগোত্রের সংখ্যা ৪০, ডিমাসা

ভাষায় বলা হয় সেমকং। নারীরা মায়ের গোত্র পায় এবং বিবাহে সে গোত্র-পরিচয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। একইভাবে পুরুষরা পায় পিতৃগোত্র এবং সেটাও অপরিবর্তনীয়। এইভাবেই বংশপরম্পরায় পিতৃগোত্র ও মাতৃগোত্রের দুটো সমান্তরাল ধারা ডিমাসা সমাজে বহমান। আবার বিয়ের ব্যাপারে পুত্র এবং কন্যা উভয়কেই পিতামাতা দুজনের গোত্রান্তর্গত বলেই ধরে নেওয়া হয়। বহির্বিবাহের (exogamy) চূড়ান্ত যে রূপটি ডিমাসা সমাজে দেখা যায়, একই গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পুত্রকন্যার উপর মাতাপিতা দুজনের গোত্র আরোপিত হওয়ার দরুন বিয়ের ক্ষেত্র হয়ে পড়ে অত্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ পুত্র তার পিতা বা মাতার গোত্রের কোনো কন্যাকে বিয়ে করতে পারবে না, একই ভাবে কন্যারও বিয়ে হবে না তার পিতা বা মাতার গোত্রান্তর্গত কোনো বরের সঙ্গে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বোডো কাছাড়ী এবং উত্তর কাছাড় জেলার ডিমাসা কাছাড়ীদের একই জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তাঁরা নিজেরাও তাই মনে করেন। কিন্তু বোডো কাছাড়ীরা গোত্রপরিচয়ের ব্যাপারে মাতৃগোত্রকে বহুদিন আগেই বর্জন করেছেন, সমতলীয় অন্যান্য হিন্দুদের মতো তাঁরা শুধু পিতৃগোত্রই ধারণ করেন। তাই একই জাতিগোষ্ঠীর লোক হওয়া সত্ত্বেও বোডোদের সঙ্গে ডিমাসাদের বিয়ে হয় না, কারণ বোডোদের ক্ষেত্রে মাতৃগোত্র নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী দীপালি দণ্ড (Danda) ডিমাসাদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে সরজমিনে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, বাইরের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিরন্তর চাপে ডিমাসারা এখন পিতৃগোত্র সম্পর্কেই অধিকতর চেতনতা প্রকাশ করেন, এবং শিক্ষিত উন্নত শ্রেণীর মধ্যে মাতৃগোত্রের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করার প্রবণতাও চোখে পড়ে।[৬২] তবুও শ্রীমতী দণ্ড মন্তব্য করেছেন যে সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে এখনও ডিমাসা সমাজে মাতৃগোত্রের প্রভাবই পিতৃগোত্রের চাইতে অধিকতর সক্রিয় বলে মনে হয়।[৬৩] তিনি দেখিয়েছেন যে মাতৃগোত্রের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে বিয়ে হয়েছে, এমন একটি ঘটনাও তিনি পান নি, কিন্তু পিতৃগোত্রের নিষেধাজ্ঞা মাঝে মধ্যে লঙ্ঘিত হয়।

বিয়ের পর মেয়েরা একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের পিতৃগোত্র ত্যাগ করে এবং স্বামীর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬৪] অনুষ্ঠানটির নাম 'মাদাই কিলমা' বা গোষ্ঠীদেবতার পূজা। কিন্তু তার মাতৃগোত্র অপরিবর্তিত থেকে যায়, এবং মাতা-

মাতামহীর ধারা থেকে প্রাপ্ত এই মাতৃগোত্র কন্যাপরম্পরায় আরোপিত হয়।[৬৪] পুরুষের ক্ষেত্রে বিয়ের পর তাদের মাতৃগোত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করতে হয় না, তবে পরবর্তী বংশধরদের উপর তার পিতৃগোত্রই শুধুমাত্র আরোপিত হয়, বংশধররা তাদের মাতৃগোত্র তো মায়ের কাছ থেকেই লাভ করে। আমরা নিজস্ব সরজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ছেলেরাই পিতৃসম্পত্তি লাভ করে, এদিক দিয়ে পুরুষ-প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ যদি কিছু থাকে, যথা গয়না, পোশাক-পরিচ্ছদ, শৌখীন জিনিসপত্রাদি, সেগুলোর মালিক কিন্তু কন্যা, পুত্রের তাতে কোনো অধিকার নেই। বিয়ের পর জামাতাকে শ্বশুরালয়ে যেতে হয়, একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য। সেটা ক্ষেত্রভেদে এক থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে। আজকাল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষিত মহলে এই রীতিটি অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে, অনেকক্ষেত্রে মেয়েরাই যায় স্বামীগৃহে। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বামীকে সাধারণত তার পিত্রালয় ত্যাগ করে নতুন আবাসের ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ ডিমাসা সমাজে একটি রীতি বেশ কড়াকড়ি ভাবেই পালন করা হয় যে দুটি ভিন্ন মাতৃগোত্রের মহিলা একই গৃহতলে রাত্রিবাস করতে পারবেন না। যেহেতু শাশুড়ির ভিন্নগোত্র হওয়াটাই বাধ্যতামূলক, অতএব ডিমাসা নারীকে সাধারণভাবে শাশুড়ির ঘর করতে হয় না। নব্যপন্থী মহিলারাও এখন পর্যন্ত বিবাহিত পুত্রের গৃহে এক-আধরাত্রি বাস করতে অস্বস্তিবোধ করেন। এই রীতি-গুলি কিন্তু মূলত মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত matrilocal বিবাহব্যবস্থার স্মারক, যেখানে বিবাহিতা নারীর শ্বশুরালয়ে গমন ছিল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত।

বিবর্তনমুখী ডিমাসা সম্প্রদায়ের বর্তমান সামাজিক অবস্থানের মৌল লক্ষণগুলির মাধ্যমে সাতবাহন যুগকে বুঝতে আমাদের কি ধরনের সুবিধা হয়, তা এবার বিচার করা যাক। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে বিবাহিতা নারীর গোত্রান্তর নিয়ে দীনেশচন্দ্র সরকার যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা একান্তই কষ্টকল্পিত; নারীর গোত্রান্তর না হওয়ার জন্য শুধুমাত্র শাস্ত্রোক্ত গন্ধর্ববিবাহই দায়ী না-ও হতে পারে। ডিমাসা নারীদের মাতৃগোত্র বিবাহোত্তর জীবনেও অপরিবর্তিত থেকে যায়, সাতবাহন যুগেও তাই ঘটত। সাতবাহন যুগে মাতৃগোত্রের প্রভাব আরেকটু বেশি ছিল বলেই পুত্ররা নামের আগে মাতৃগোত্র ব্যবহার করত। দীনেশবাবু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যেহেতু বিবাহিতা নারীদের গোত্রান্তর ঘটত না, অতএব সে যুগে 'বিবাহ পদ্ধতি 'সুনিয়ন্ত্রিত' ছিল না। গোত্রের ব্যাপারে কড়া বাধানিষেধকে

যদি 'সুনিয়ন্ত্রণে'র লক্ষণ বলে ধরা যায়, তবে দেখা যাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য বিবাহ-ব্যবস্থার চাইতেও ডিমাসাদের বিবাহবিধি আরও অনেক সুনিয়ন্ত্রিত। কারণ হিন্দু বিধিতে শুধুমাত্র পিতৃগোত্রের বাধানিষেধই মানা হয়। ডিমাসারা পিতা-মাতা দুদিকের গোত্রপরিচয়কেই বিয়ের ব্যাপারে কড়াকড়িভাবে মেনে চলেন।[৬৬] এত সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায়ও যখন বিবাহিতা ডিমাসা নারীর মাতৃগোত্রের পরিবর্তন হয় না, তখন বুঝতে হবে যে গোত্রপরিচয় বজায় রাখার সঙ্গে বিবাহব্যবস্থার সু বা কু কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণেরই সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক রয়েছে সামাজিক বিবর্তনের বিশেষ পর্যায়ের সঙ্গে। বিচার-বিভ্রাটটা ঘটেছে—প্রথমত, সমাজ থেকে তথ্য সংগ্রহ না করে শুধুমাত্র পুঁথি থেকে তথ্য সংগ্রহের দরুন এবং দ্বিতীয়ত, প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রবিধির আলোকে গোত্রের সমস্যাটাকে বিচার করার জন্য।

আমরা লিপিপ্রমাণে পাচ্ছি যে সাতবাহন নারীরা বিত্তর দান করেছেন এবং তা থেকে অনুমান করেছি যে সম্পত্তির আংশিক মালিকানার অধিকার তাঁদের সম্ভবত ছিল। কিন্তু সে অধিকারের স্বরূপ কি ছিল তা আমরা যথাযথভাবে জানি না। ডিমাসাদের দৃষ্টান্ত থেকে সে-বিষয়ে কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। ডিমাসা নারীরা আজকের যুগেও মায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। ডিমাসাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দরিদ্র, সে ক্ষেত্রে ডিমাসা নারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণও যৎসামান্য। কিন্তু সাতবাহন যুগ ছিল সম্পদের যুগ। সেযুগের অভিজাত রমণীদের ব্যক্তিগত সম্পদ নিশ্চয়ই এত অনুল্লেখ্য ছিল না। সুতরাং, যদি ধরে নিই ডিমাসাদের মতো সাতবাহন নারীরাও মাতৃসম্পত্তি লাভ করতেন, তবে অভিজাত মহিলাদের দানধ্যানের উৎস সম্পর্কে আমাদের সন্দেহের নিরসন হওয়া সম্ভব।

Matrilocal বিবাহ-পদ্ধতি মাতৃপ্রধান সমাজের একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ। উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসি উপজাতীয়দের মধ্যে এই পদ্ধতি পুরোদস্তুর চালু আছে, যেমন চালু আছে দক্ষিণ ভারতের কিছু জাতির মধ্যে। অর্থাৎ এই সমস্ত জাতির ক্ষেত্রে বরই বিয়ের পর শ্বশুরগৃহে চলে আসে। ডিমাসারা পিতৃপ্রাধান্যের দিকে খাসিদের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর বলে তারা এই প্রথা পুরোপুরি মানেন না। তবে আংশিকভাবে তা এখনও বজায় রয়েছে। অপেক্ষাকৃত উন্নতদের মধ্যে এই আংশিক অস্তিত্বও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সাতবাহনেরা, বিশেষ করে তাঁদের সমাজের অভিজাত অংশ, পুরুষপ্রাধান্যের দিকে আরেকটু বেশি

অপ্রসন্ন ছিল বলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন না, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে যে প্রথাটা টিঁকে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাছাড়া সাতবাহন লিপিমালায় মাতৃধারার আত্মীয়স্বজনের যত উল্লেখ পাওয়া যায়, পিতৃবংশের লোকজনের কথা তার তুলনায় খুবই কম উল্লিখিত হয়েছে। ডিমাসাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করার পরও স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরের গ্রামে বা শ্বশুরালয়ের আশেপাশেই ঘর বাঁধে। সেক্ষেত্রে, সামাজিক আচার-আচরণের সর্বক্ষেত্রে মাতৃধারার আত্মীয়স্বজনরাই যে প্রাধান্য বিস্তার করবেন—তা বলাই বাহুল্য। সাতবাহন যুগেও সমজাতীয় পরিস্থিতির অস্তিত্ব ছিল, এমন অনুমান বাতিল করা যায় না।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষপ্রাধান্য এবং অনুষঙ্গ হিসাবে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা ডিমাসা সমাজে এখন সুপ্রচলিত। ডিমাসারাই সম্ভবত আসামের প্রথম স্থানীয় উপজাতি যারা আজ থেকে সহস্র বৎসর আগে রাজ্য সংগঠন করেছিলেন এবং রাজ্য সংগঠনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁদের মধ্যে পিতৃপ্রাধান্যের প্রবণতা শুরু হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। উত্তরাধিকারী হিসাবে পুত্রের স্বীকৃতি লাভ নিশ্চয়ই রাজপরিবারেই প্রথম শুরু হয়েছিল, কিন্তু তার কালনির্ণয় সম্ভব নয়। পুরুষ গোত্রের ধারণাটাও নিশ্চয়ই তখনই শুরু হয়েছিল, তবুও ডিমাসা নারীরা ক' বছর আগেও মায়ের গোত্রকেই পদবী হিসাবে ব্যবহার করতেন, কিন্তু সাম্প্রতিককালে অতিদ্রুত সে রীতি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এই পরিবর্তনে অভ্যন্তরীণ সামাজিক বিবর্তনপ্রক্রিয়া যতখানি কাজ করেছে, ঠিক ততখানিই কাজ করেছে বাইরে দুনিয়ার বিপরীত সামাজিক আবহের প্রভাব। আজ শিক্ষিত ডিমাসাদের সংখ্যাগুরু অংশ নিজেদের মাতৃগোত্রের উল্লেখ করতেও অনেক সময় সংকোচবোধ করেন। প্রাচীন দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে সাতবাহন-পরবর্তী রাজবংশগুলি কিছু ক্ষেত্রে মাতৃগোত্র টিঁকিয়ে রাখার প্রয়াস চালালেও দুশো বছরের মধ্যে এ রীতিকে নির্বাসিত করতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রেও মনে হয় সামাজিক বিবর্তন এবং বাইরের প্রতিকূল আবহ, দুটোই সমানভাবে কার্যকরী প্রভাব ফেলেছিল। অভ্যন্তরীণ বিবর্তনের সাক্ষ্য পাচ্ছি একটি লিপিতে, যেখানে প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে একজন মাতৃগোত্রধারী সাতবাহন রাজপুরুষ পিতৃপরিচয়ও ব্যবহার করেছেন, যদিও পিতৃপরিচয় প্রদানকালেও পিতার মাতৃগোত্রটির উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি।

দুগনক্কির বার্তাবাহী এই লিপিটির উল্লেখ আমরা আগে করেছি। বাইরের

প্রভাবের পরিচয় পাচ্ছি তথাকথিত 'পিতৃভক্ত'দের মধ্যে—যাঁরা পিতৃপ্রাধান্যের আদেশকেসম্ভবত কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগেই আরোপ করতে উদ্যোগী ছিলেন। উল্লেখ্য যে ডিমাসা রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র (ঊনবিংশ শতাব্দী) কাছাড় জেলার সমতলীয় ডিমাসাদের মধ্যে এই ধরনের পিতৃপ্রধান আদর্শ চাপিয়ে দিয়েছিলেন স্বীয় রাজসভায় সমাসীন বাঙালি ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায়। উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য ডিমাসারা এই রাজকীয় হস্তক্ষেপকে অস্বীকার করেছিলেন, যে কারণে সমতলীয় ডিমাসাদের সঙ্গে পার্বত্য ডিমাসাদের কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটে যায়। রাজার নেতৃত্বে সমতলীয় ডিমাসারা নিজেদের 'পিতৃপন্থী' বলে ঘোষণা করেছিলেন, এবং 'মাতৃপন্থী' পার্বত্য ডিমাসাদের সঙ্গে নিজেদের সামাজিক মর্যাদার একটি কল্পিত পার্থক্য সৃষ্টি করেন।[৩৭] ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ব্রাহ্মণ্য গোত্রনামে তাঁদের নতুন গোত্রপরিচয় প্রদান করেন, এবং তখন থেকে এদের পুরুষরা উপজাতীয় পিতৃপদবী বর্জন করে 'বর্মণ' পদবী ব্যবহার করতে শুরু করেন। কিন্তু মাতৃগোত্রের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্য রীতি কার্যকরী হয়নি, কারণ মাতৃগোত্রের ব্যাপারটাই ব্রাহ্মণ্য সমাজে অপ্রচলিত। ফলে 'বর্মণ' ডিমাসাদের ক্ষেত্রেও মাতৃগোত্রের ধারা প্রাচীন উপজাতীয় রীতিতেই বহমান রইল। নব্য এই 'পিতৃপন্থা' গ্রহণের সামাজিক ফল যেটা ফলেছে, তা কৌতূহলোদ্দীপক। উপজাতীয় পিতৃগোত্র পরিহার করায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'বর্মণ' পুরুষদের পার্বত্য ডিমাসা সমাজে অপাংক্তেয় বলে ধরা হয়, অন্ততপক্ষে বিবাহের ক্ষেত্রে। পার্বত্য ডিমাসা বধূলাভ করা এখনও অধিকাংশ বর্মণ যুবকের পক্ষে অসম্ভব। অপরদিকে মাতৃগোত্র যথাযথভাবে বজায় রাখায় পার্বত্য ডিমাসারা বর্মণ সম্প্রদায় থেকে বধূ-নির্বাচনে কোনোরূপ অসুবিধা বোধ করেন না, বস্তুত উত্তর কাছাড়ের অধিকাংশ উন্নত পরিবারের গৃহবধূই বর্মণ সম্প্রদায়ের কন্যা। সাতবাহন-পরবর্তীযুগে 'পিতৃভক্ত'-দের সঙ্গে মাতৃগোত্রধারীদের সামাজিক সংঘাতের বিবরণ আমরা জানি না, কিন্তু ডিমাসা সমাজের দৃষ্টান্ত থেকে তার স্বরূপের কিছুটা আভাস আমরা পেয়ে যাই।

৬

মাতৃগোত্র ও পিতৃগোত্রের সমান্তরাল ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত ডিমাসা সমাজে লভ্য, সাতবাহনযুগে সে-ধরনের কোনো রীতির ধারাবাহিক অস্তিত্বের কোনো সরাসরি প্রমাণ আমরা পাচ্ছি না। অবশ্য সাতবাহন যুগের অন্তত একটি লিপিতে গৌতমী-পুত্র সাতকর্ণি এবং বশিষ্ঠিপুত্র পুলোমায়ীর উপর পিতৃগোত্রও আরোপ করা হয়েছে, তার প্রমাণ পাচ্ছি। সেখানে তাদের পিতৃগোত্র বলা হয়েছে 'বৃহৎফলায়ন'।[৩৮]

পরবর্তী পর্যায়ে মানব্য, বিষ্ণুবৃদ্ধ, শালঙ্কায়ন, আনন্দ ইত্যাদি পিতৃগোত্রই প্রাধান্য পেয়েছে, কদাচিৎ এঁদের কেউ কেউ মাতৃগোত্র (হারীতিপুত্র) ব্যবহার করেছেন। ভিমাসাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, সাম্প্রতিককালে পিতৃগোত্রের প্রাধান্য প্রকাশ্যে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও মাতৃগোত্রের অন্তর্লীন অস্তিত্ব সামাজিক ক্ষেত্রে এখনও গুরুত্বপূর্ণ। সাতবাহন-পরবর্তীযুগে পিতৃগোত্র যখন সর্বত্রই প্রকাশ্যে সমাদর লাভ করেছে, তখনও একইভাবে মাতৃগোত্রের প্রভাব কিছুদিন পর্যন্ত অন্তর্লীন ছিল, এমন অনুমান বোধহয় অসঙ্গত ছিল না।

সমান্তরালভাবে দুই ধরনের গোত্রপরিচয়ই সমাজে বহমান থাকাটাও পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতিরই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। দীপালি দত্ত সমাজতত্ত্ববিদদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, "... double descent would result when a people with strongly functional exogamous matrilineal kin-group come to adopt patrilocal residence and to organise politically on a local basis in consequence either of outside contacts or internal adjustment"[৩৯] সাতবাহন যুগের যে চিত্রটি মোটামুটিভাবে আমাদের আলোচনায় ধরা পড়েছে, তার সঙ্গে এই উদ্ধৃতিতে বর্ণিত পরিস্থিতির মিল রয়েছে।

শ্রীমতী দত্তের বক্তব্যে বহির্বিবাহ বা exogamy-র যে উল্লেখ রয়েছে, তাকে কিছুটা সম্প্রসারিত করলে সাতবাহন যুগের আরও কিছু তথ্যের যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভবপর হবে। গোত্রপরিচয় বজায় রাখার রীতি যে-সমস্ত সমাজে প্রচলিত, তাঁরা যে এই পরিচিতিকে বিবাহবিধি নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনে ব্যবহার করেন, সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ মাতৃপ্রধান সমাজেই মাতৃগোত্রধারীদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ। এই ধরনের কোনো সমাজে যদি পিতৃগোত্রের ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হয়, তবে এটা খুবই স্বাভাবিক যে পিতৃগোত্রের মধ্যেও সেখানে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ হবে। কারণ সেই ধরনের সমাজে গোত্রপরিচয়কে অন্তর্বিবাহ নিবারণের একটা হাতিয়ার হিসাবেই ধরে নেওয়া হয়।

এদেশের হিন্দুসমাজে অন্তর্বিবাহের ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা এখনও কার্যকরী রয়েছে, তা শুধুমাত্র পিতৃগোত্রের মধ্যে। মাতৃগোত্রের প্রশ্নটাই এক্ষেত্রে অবান্তর, কারণ বিয়ের সময়ে গোত্রান্তরের মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীর গোত্রপরিচয় লাভ করেন। দেখা গেছে, শুধুমাত্র পিতৃগোত্রের বাধানিষেধ থাকার জন্যই অনেক ক্ষেত্রে বর-কনে সংগ্রহের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং বিস্তর অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিস্তৃত সমতলীয় হিন্দুসমাজে যদি এই অবস্থা, তবে মাত্র পঞ্চাশ হাজার লোকসংখ্যা বিশিষ্ট ভিমাসা

সমাজে দ্বিমুখী নিষেধাজ্ঞা কতখানি সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে, তা সহজেই অনুমেয়। পাত্র-পাত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্র যত সঙ্কুচিত হয়, নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রবণতাও ততই বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে এই ধরনের সমাজ সততই একধরনের অবস্থিতে ভোগে। তাছাড়া বিভিন্ন পরিবারের দ্বিমুখী গোত্রপরিচয় সকল সময়ে মনে রাখাও বেশ একটা জটিল ব্যাপার। সাম্প্রতিক কালে মুদ্রিত তালিকার মাধ্যমে এই অসুবিধা দূরীকরণের প্রয়াস চলতেও দেখেছি।

কিন্তু সাধারণভাবে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্বিমুখী গোত্র-নিষেধাজ্ঞার অধীন এই সমস্ত সমাজ বিবাহ-সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছিল, তা হলো cross-cousin marriage বা মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ। এই ধরনের বিবাহ কিছুদিন আগেও ডিমাসা সমাজে আদর্শ-বিবাহ হিসাবে ধরে নেওয়া হতো, এখন অবশ্য বাইরের ভাবাদর্শের প্রভাবে এর জনপ্রিয়তা ক্রমক্ষীয়মান।[৭০] Cross-cousin marriage সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে, এবং এই প্রথার মধ্যে যে মাতৃপ্রাধান্যের অবশেষ রয়ে গেছে, তাও মোটামুটি স্বীকৃত।[৭১] কিন্তু এই ধরনের বিবাহ যে মাতৃ এবং পিতৃগোত্রের যুগ্ম বাধানিষেধের ক্ষেত্রে সবচাইতে নিরাপদ বিবাহবিধি, সে কথাটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।[৭২] বিবাহোত্তর জীবনে ভাই বজায় রাখে পিতৃগোত্র, বোন বজায় রাখে মাতৃগোত্র এবং তাদের বিয়ে হচ্ছে যথাক্রমে ভিন্নগোত্রের নারী ও পুরুষের সঙ্গে। সেক্ষেত্রে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে তাঁদের সন্ততিদের গোত্রপরিচয় সর্বাবস্থায়ই ভিন্ন হবে। তাই পিসতুতো ভাই বা পিসতুতো বোনের সঙ্গে যথাক্রমে মামাতো বোন বা মামাতো ভাইয়ের বিয়ে হলে ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত অন্তর্বিবাহের সংঘটন-সম্ভাবনা একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়।

দক্ষিণ ভারতে এই ধরনের বিবাহের জনপ্রিয়তার কথা আমরা জানি, কিন্তু শুধু সেখানে নয়, পশ্চিম ভারতের উচ্চবর্ণের মধ্যেও এই ধরনের বিবাহ বেশ ব্যাপকভাবেই প্রচলিত। ইরাবতী কার্ভে জানাচ্ছেন যে গুজরাট ও রাজপুতনায় রাজপুত, কাথি ও অন্যান্য যোদ্ধা জাতির মধ্যে মামাতো বোন-পিসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে কোনো সামাজিক নিষেধ নেই।[৭৩] পিসতুতো বোন-মামাতো ভাইয়ের মধ্যে বিয়ে অবশ্য হয় না। আরেকটু দক্ষিণে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে মারাঠীভাষীরা সবাই পিসতুতো ভাইবোন এবং মামাতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে আপত্তিকর কিছু দেখেন না।[৭৪] আরো দক্ষিণে গেলে—তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ও কানাড়ীভাষীদের মধ্যে দুই ধরনের cross-

cousin marriage-ই প্রচলিত।[১৫] গোদাবরী তীরবর্তী এক বিস্তৃত অঞ্চলে এই ধরনের বিয়ের প্রচলন এখন কমে গেছে, ভাষাপ্রয়োগের মধ্যে তার প্রাচীন অস্তিত্বের চিহ্ন রয়ে গেছে। ইরাবতী কার্ভে দেখিয়েছেন যে শুধুমাত্র দুটো পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যদি বর এবং কনের আদানপ্রদান ঘটে, তবে বৈবাহিক সম্পর্ক বোঝাতে যে-ধরনের অভিধা ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব, ঠিক সেই ধরনের শব্দগুলোই স্থানীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। বাস্তবক্ষেত্রে এত দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের অনুনাঞ্চ প্রমাণ অবশ্য ইরাবতী কার্ভে খুঁজে পাননি, কিন্তু অতীত রীতির স্মারক যে স্থানীয় ভাষায় রয়ে গেছে, সে সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ।[১৬] তিবাসা সমাজের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দেখিয়েছি যে মাতৃ এবং পিতৃগোত্রের দ্বৈত ভূমিকা যখন অন্তর্বিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন cross-cousin marriage-কে সবচাইতে নিরাপদ ব্যবস্থা বলে ধরে নেওয়া হয়। দীপালি দত্ত বলেছেন যে মাতৃপ্রধান সমাজ যখন পিতৃপ্রাধান্যের অনুপ্রবেশকে ঠেকাতে পারে না, তখনই এই ধরনের মাতৃ-পিতৃ গোত্রের যুগ্ম অস্তিত্ব সমাজকে মেনে নিতে হয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং দক্ষিণ ভারতের যে অঞ্চলগুলিতে আমরা cross-cousin marriage-এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাচ্ছি, সেই অঞ্চলগুলোকে তাহলে আমরা কোনো-না-কোনো সময়ের মাতৃপ্রাধান্য-প্রভাবিত অঞ্চল বলে চিহ্নিত করতে পারি।

কৌতূহলপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, যে-সমস্ত অঞ্চলে আমরা এই ধরনের বিবাহের অস্তিত্বের প্রমাণ বা অবশেষ খুঁজে পাচ্ছি, সাতবাহন যুগে মোটামুটিভাবে সেই অঞ্চলগুলিতেই কিন্তু ব্যাপকভাবে মাতৃগোত্র ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এই যোগাযোগটা কোনোমতেই আকস্মিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। Cross-cousin marriage-এর সরাসরি প্রমাণ অবশ্য লিপিগুলিতে খুব একটা নেই। একটা জোরালো প্রমাণ শুধু আছে ইক্ষ্বাকু বংশের ক্ষেত্রে। রাজা মাঢ়রীপুত্র বীরপুরুষদত্ত বিয়ে করেছিলেন পিসতুতো বোনকে। বীরপুরুষদত্তের পিতা ছিলেন বাশিষ্ঠিপুত্র, অতএব বীরপুরুষদত্তের পিসও ছিলেন বাশিষ্ঠিপুত্রী, এবং মাতৃধারায় গোত্রপরিচয় বহন করার তিবাসা রীতি প্রয়োগ করলে দেখা যাবে তার পিসতুতো বোনেরাও ছিলেন বাশিষ্ঠিপুত্রী। এই ধারণা যে যথার্থ তার প্রমাণ পাই যখন দেখি বীরপুরুষদত্তের ছেলে বাহুবল চান্তমূল নিজের নামের সঙ্গে মাতৃগোত্র জুড়েছেন বাশিষ্ঠিপুত্র। এখানে এসে আমরা আরেকটি সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। হিসেব করলে দেখা যাবে, কোনো দুটো পরিবার যদি পিসতুতো-মামাতো ভাইবোনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক (bilateral) বিবাহের ধারাকে অব্যাহত

রাখে, তাহলে প্রতি দ্বিতীয় পুরুষে একই মাতৃগোত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটবে। এখানে যেমন বশিষ্টিপুত্র চাস্তনের নাতির নাম দাঁড়াচ্ছে বশিষ্টিপুত্র দামবল চাস্তন। সাতবাহন রাজাদের মধ্যে এই ধরনের বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল কিনা সে ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য লিপিপ্রমাণ আমাদের নেই। কিন্তু গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির পরবর্তী মাতৃগোত্রধারী সাতবাহন রাজাদের তালিকায় বারবারই যে গৌতমীপুত্র ও বশিষ্টিপুত্র, এই দুটি অভিধা ঘুরে ফিরে আসছে, তার পেছনে এই ধরনের বিবাহের প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। মধ্যে মধ্যে কৌশিকীপুত্র ও মাঢরীপুত্রের আবির্ভাব সম্ভবত কোনো কোনো সময়ে সংশ্লিষ্ট পরিবারে কন্যা সন্তানের অভাববশতই ঘটত।

Cross-cousin marriage-এর উৎস নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি মূলত সমাজতত্ত্বের আওতায় পড়ে, তবে রামশরণ শর্মা সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণালব্ধ তথ্যগুলিকে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছেন।[11] রক্তগত ঐক্যের প্রতি আনুগত্য, রক্তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং পারিবারিক সম্পর্কের সংহতি-সাধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি, এই তিনটি কারণের উপরই সমাজতাত্ত্বিকরা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এগুলি নিশ্চয়ই এই ধরনের বিবাহের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের ধারণা, আরও দু-একটি উপাদান cross-cousin marriage-এর উদ্ভব এবং বিকাশের ক্ষেত্রে কাজ করেছিল। তার একটা হচ্ছে অন্তর্বিবাহ রোধ করার ব্যাপারে এই প্রথার উপযোগিতা, যার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। আরেকটি উপাদান, আমাদের ধারণা, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যার দাবির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান।

মাতৃপ্রধান সমাজ যখন পিতৃপ্রাধান্যের অধীনে আসে, তখন কন্যার সম্পত্তির উপর যে চিরাচরিত অধিকার ছিল, তা চলে যাচ্ছে পুত্রের কাছে। এই পরিবর্তন যে প্রতিরোধ ব্যতিরেকেই সম্পন্ন হয়েছে, এমন চিন্তা করা অবাস্তব। সেই প্রতিরোধকে কিছুটা দুর্বল করার ব্যাপারে এই ধরনের বিবাহের কিছুটা ভূমিকা থাকা সম্ভবপর। ধরা যাক, মাতৃপ্রধান সমাজের একটি রাজপরিবারের কথা। সেখানে রানীর মেয়ের রানী হওয়াই রীতি, সে রীতি পরিবর্তিত হয়ে যখন রাজপুত্রের রাজা হওয়ার নিয়ম চালু হবে, তখন বঞ্চনার বেদনা রাজকন্যাদের সমাজে একটা অভ্যন্তরীণ আলোড়ন তুলবেই। Cross-cousin marriage-এর ক্ষেত্রে বঞ্চিতা রাজকন্যার কন্যা-সন্তানটি রানী হয়ে ফিরে আসছে সেই গৃহে, যেখানে তাঁর মায়ের

রানী হওয়ার কথা ছিল। অর্থাৎ প্রথম পুরুষে বঞ্চিত হলেও দ্বিতীয় পুরুষে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার এই বিবাহ-পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্লীন। দক্ষিণ ভারতের একটি অভিজাত পরিবারে আধুনিক যুগেও একটু অন্য পদ্ধতিতে বিলম্বিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আমরা লক্ষ্য করি। ব্রিটিশ যুগের করদ-মিত্ররাজ্য ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে রাজার বোনকে বলা হতো রানী, যদিও রানীর সমস্ত অধিকার সম্ভবত তিনি ভোগ করতেন না।[৭৮] কিন্তু ঐ রাজভগিনী তথা রানীর পুত্রই সিংহাসনে বসতেন, সেই রীতিতে ব্রিটিশরাও হস্তক্ষেপ করেনি। পূর্ব ভারতের খাসিয়াদের মধ্যে উত্তরাধিকার এখনও কন্যার ধারায় প্রবাহিত, কিন্তু তাঁরা যে জয়ন্তীয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে ভাগিনেয়ই রাজা হতো, ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত এই রীতিই চালু ছিল। Cross-cousin marriage-এরই মতো এই রীতিও একধরনের আপস রফা। পার্থক্য হচ্ছে—একটাতে রাজকন্যার মেয়ে রানী হয়ে ফিরে আসছেন, এবং অন্যটাতে রাজকন্যারাই ধারাবাহিকভাবে রাজমাতা হচ্ছেন।

এ-যাবৎ যে আলোচনা করা হলো তার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বোধহয় এখন নিঃসংশয়েই বলা যায় যে মাতৃগোত্র বা মাতৃপরিচয়ের ব্যবহার সামাজিক বিবর্তনের একটা পর্যায়ের স্মারক। সাতবাহন যুগে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন এই সমাজের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল, সামাজিক পটভূমিকে বুঝতে সাহায্য করে। ক্রান্তি-কালীন এই সমস্ত যুগলক্ষণকে প্রচলিত পিতৃপ্রধান সমাজের প্রথাসিদ্ধ মানদণ্ডে বিচার করতে গেলে বিচার-বিভ্রাট অনিবার্য এবং ঐ ধরনের বিচার-বিভ্রাটই ঐ যুগের স্বরূপটির সঠিক উপলব্ধির ব্যাপারে আমাদের ইতিহাস-চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

৭

এ পর্যন্ত আমাদের আলোচনায় সাতবাহন যুগের সামাজিক স্বরূপটিকে আমরা ধরবার চেষ্টা করেছি, এবং আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সেই স্বরূপটি পরিবর্তনমুখী ছিল। সেই পরিবর্তনের বস্তুভিত্তি কি ছিল, সে প্রশ্ন এবারে নিশ্চয়ই উঠতে পারে। মাতৃপ্রাধান্য থেকে পিতৃপ্রাধান্যে একটি সমাজ উত্তীর্ণ হচ্ছে, উত্তরাধিকার মাতৃধারা থেকে পিতৃধারার খাতে বইতে শুরু করেছে, এই যে সমস্ত পালাবদল, সেগুলো নিশ্চয়ই অকারণ পুলকে ঘটছে না, সমাজের ভেতরে কিংবা বাইরে এর সহযোগী জোরালো উপাদানের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। বাইরের উপাদানকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম উত্তর ভারত থেকে পশ্চিম-দক্ষিণ ভারতে

তখন সঙ্ঘ অনুপ্রবেশ করেছে, এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের উদ্ভব সৃষ্টি করেছে নতুন রাজনৈতিক আদর্শ। এ দুটি উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সদ্য উজ্জীবিত বাণিজ্যিক অর্থনীতি। এগুলির সম্মিলিত অভিঘাত এই অঞ্চলের সামাজিক কাঠামোর সামনে নতুন কতকগুলি বিকল্প উপস্থাপিত করেছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অনুকূল উপাদান সঞ্চিত না হলে শুধুমাত্র বহিরাগত প্রভাব একটি সামাজিক সংগঠনের মৌলভিত্তিকে টলাতে পারে না। উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটলেই শুধু নতুন বস্তুভিত্তির জন্ম হতে পারে, যা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠামোর পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তুলতে পারে। অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন-সম্পর্কের ব্যাপক এবং গুণগত পরিবর্তনই নতুন সামাজিক আদর্শের অনুকূল বস্তুভিত্তির জন্ম দিতে পারে। পরিবর্তনমুখী সমাজ তাই সাধারণভাবে পরিবর্তিত উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাতবাহন যুগ বা তার ঈষৎ পূর্ববর্তীকালে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে উৎপাদন পদ্ধতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল কিনা, এবং ঘটে থাকলে তা একটি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কাঠামোতে ভাঙন ধরানোর মতো জোরালো ছিল কিনা, এ প্রশ্নগুলো বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

একটি মাতৃপ্রধান সমাজ কখন পিতৃপ্রাধান্যের দিকে ঝোঁকে? জর্জ টমসন বলেছেন যে লাঙলভিত্তিক কৃষির প্রচলন আদিম কৃষিজীবী সমাজের মধ্যে মেয়েদের যে সম্মানের আসন নির্ধারিত ছিল, তা টলিয়ে দেয়।[৭৯] কোসাম্বী বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন যে আদিম কৃষিজীবী সমাজে মেয়েরাই ছিলেন পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু, কারণ তখনও উদ্বৃত্ত সম্পদের সৃষ্টি হয়নি।[৮০] পুরুষের পরিশ্রমে যখন উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্ট হতে শুরু হলো, তখনই উত্তরাধিকারের প্রশ্নে নারীর অগ্রাধিকারের রীতিটির উপর নানাধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ হতে লাগল। তামা জাতীয় ধাতু আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষি উৎপাদন বাড়ছিল, তারই সঙ্গে বাড়ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষপ্রাধান্য। কিন্তু তখনও সামাজিক পরিবর্তনের ধারাটি ছিল শ্লথগতি, কারণ গোটা সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আগাপাশতলা বদলে দেওয়ার মতো বৈপ্লবিক পরিবর্তন উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সঞ্চারিত করা তামা বা ব্রোঞ্জ-জাতীয় ধাতুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে-ধরনের পরিবর্তনটা ঘটল লোহার ব্যবহার শুরু হওয়ার পর। বৃহৎ অরণ্যভূমিকে পরিষ্কার করে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা লোহার অস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া লোহার তৈরি লাঙলের সাহায্যে কৃষি উৎপাদনে যে বিপ্লবটি ঘটল, তার ফলে উৎপন্ন হতে লাগল

পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত ফসল এবং সে ফসল তৈরি হচ্ছে পুরুষের পরিশ্রমে। কৃষিকাজে মেয়েদের অগ্রাধিকার আর রইল না, কারণ পশুবাহিত লাঙল চালনা করাটা শারীরিক কারণেই মেয়েদের পক্ষে সাধ্যাতীত। পুরুষেরই এই উদ্বৃত্ত ফসল তৈরি করল ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সেই সম্পদ যাতে নিজ সন্তানই ভোগ করতে পারে তারই জন্য জন্ম হলো পিতৃপ্রধান সামাজিক আদর্শের। সর্বত্রই যে ফর্মুলা-মাফিক একই ধরনের বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী পর্যায়ক্রমে ঘটে গেছে তা নয়, কোথাও কোথাও বিশিষ্ট কোনো কারণে এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে, কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের এটাই হচ্ছে সাধারণ ছক। এই ছকটির পরিপ্রেক্ষিতেই কোসাম্বীর নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত : "Matriarchal Institutions still survive in those part of the country that took last to plough economy."[৮১]

প্রশ্ন হচ্ছে, সাতবাহন যুগে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি কি এই ধরনের কোনো পরিবর্তনের মুখোমুখি ছিল? অন্য একটি প্রসঙ্গ আলোচনাকালে কোসাম্বী দাক্ষিণাত্যে উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের বিবরণ দিয়েছেন।[৮২] সুত্তনিপাত গ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক জনৈক ব্রাহ্মণের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর নাম বাবরি, মূল বাড়ি কোশলদেশে। বাবরি দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যিক রাস্তা ধরে পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত গোদাবরী তীরে অশ্মকদের দেশে এসে এখানেই শিষ্যদের নিয়ে বসবাস শুরু করেন। কালক্রমে তাঁর এই শিক্ষাশ্রমকে কেন্দ্র করে একটি গ্রাম গড়ে ওঠে এবং তিনি পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করে একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কোসাম্বী অনুমান করেন যে এই গল্পের মধ্যেই উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের দক্ষিণ ভারতে আগমনের সূচনাপর্বটি বিধৃত এবং মোটামুটিভাবে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালে এর সূত্রপাত।

দক্ষিণ ভারতে লোহার ব্যবহার বোধহয় উত্তর-ভারতীয় আদর্শে শুরু হয়নি, কারণ এক ধরনের স্থানীয় লৌহশিল্প যে এখানে গড়ে উঠেছিল, তার কিছু অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে।[৮৩] কিন্তু সে লৌহশিল্প খুব উন্নত পর্যায়ের ছিল না। তাই কোসাম্বী বলছেন যে লোহার যে-ধরনের ব্যাপক ও সমুন্নত ব্যবহারের মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যে একটা কৃষিবিপ্লব ঘটানো সম্ভব ছিল, সেই জ্ঞান এসেছিল উত্তর ভারত থেকে। এই অঞ্চলের শক্ত কৃষ্ণ-মৃত্তিকাকে উৎপাদনযোগ্য করে কর্ষণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল খুব ভারী জাতের লাঙলের, যাকে অনেক সময়ে ছয় থেকে আট জোড়া বলদকে টানতে হয়। ঋগ্বেদে এই ধরনের লাঙলের উল্লেখ রয়েছে। এই ধরনের লাঙল তৈরি করার বিদ্যা দাক্ষিণাত্যে জানা ছিল না। আরেকটু হালকা ধরনের কৃষাণ-

যুগের লাঙলও প্রচলিত হয়েছিল, কিন্তু তার উপযোগিতা সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে। যাই হোক, উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যে-কটি যুগান্তকারী উপাদান এসে ঢুকল, লোহার লাঙল যে তার অন্যতম, সে সত্য অস্বীকার করা যায় না। নতুন এই কৃষিপদ্ধতি অনেক জায়গায়ই শাবল ও কোদালের আদিম উৎপাদন পদ্ধতিকে হটিয়ে দিল। বুদ্ধদেবের যুগে এই পরিবর্তনের সূত্রপাত, মৌর্য যুগের অনুকূল আবহ এর গতিবেগকে বাড়িয়ে দেয়।

কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ব্যাপক রূপান্তর দাক্ষিণাত্যের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে কিভাবে পালটে দেয়, তাও কোসাম্বী সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। প্রথমত, সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন আনল, তাতেই সাতবাহন রাজ্য গড়ে ওঠা সম্ভব হলো। কারণ স্থানীয় সমৃদ্ধি ডেকে নিয়ে আসে পণ্যবাহী বণিকদের, সঙ্গে এলেন বৌদ্ধশ্রমণ। একের পর এক বৌদ্ধমঠ গড়ে উঠল। এই মঠগুলি ছিল একাধারে নতুন কৃষিবিপ্লবের পথিকৃৎ বণিকদের আশ্রয়শিবির এবং অস্থায়ী সংরক্ষণাগার। নতুন অর্থনীতিতে যে উদ্বৃত্ত সম্পদের সৃষ্টি হলো, তাতেই ট্রাইবেল সমাজ ভেঙে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হলো। দ্বিতীয়ত, লোহার ব্যাপক ব্যবহার রাজার সহযোগী গোষ্ঠীকে অস্ত্রধারী করে তুলল এবং রাজ্যের সীমারেখা বিস্তারের প্রবণতার জন্ম হলো। তৃতীয়ত, জাতিভেদপ্রথা-সহ বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য সামাজিক আদর্শ দাক্ষিণাত্যে অনুপ্রবিষ্ট হলো। চতুর্থত, উন্নত ধরনের কৃষিপদ্ধতি যারা গ্রহণ করল, শস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি তাদের জনসংখ্যার স্ফীতিসাধন করল, ফলে যারা আদিম উৎপাদন পদ্ধতি আঁকড়ে রইল, তারা নিতান্তই সংখ্যালঘু এবং অনুন্নত পর্যায়ে নেমে গেল।

আর. এস. শর্মা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা বলেছেন।[৮৮] তা হলো, এ যুগেই এই অঞ্চলে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি হলো। প্রত্নলিপির মধ্যে প্রায়শই যে ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব ছাড়া তা সম্ভবপর ছিল না। কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির এই যে ব্যাপক পরিবর্তন, তা নিশ্চয়ই একদিনে সম্ভবপর হয়নি, বস্তুত এটা একটা সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। আধুনিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলে ধারণাটা আরো পরিষ্কার হবে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে—ত্রিপুরা, উত্তর কাছাড়, মিজোরাম, অরুণাচল ইত্যাদি অঞ্চলের উপজাতীয়রা 'ঝুম' প্রথায় অর্থাৎ আদিম কৃষিপদ্ধতিতে চাষ করেন। যেহেতু এই ধরনের চাষে বনজসম্পদ বিনষ্ট হয় (বন জ্বালিয়ে তারপর বীজ ফেলে দেওয়া হয়), এবং সেই জমির

তুলনায় উৎপাদন হয় যৎসামান্য, অতএব স্বাধীনতার পর থেকেই এই সমস্ত উপজাতীয়দের আধুনিক কৃষিপদ্ধতি গ্রহণে প্ররোচিত করার জন্য বিস্তর সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত 'ঝুম' চাষ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি, উপজাতীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনও আদি পদ্ধতিই আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক যুগে, চারিদিককার পরিবেশ যখন খুবই অনুকূল, তখনও কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন খুবই বিলম্বিত লয়ে ঘটছে। অতএব আজ থেকে দু' হাজার বছর আগে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে নতুন কৃষিপদ্ধতি পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হতে যে কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। কিন্তু পরিবর্তন ধীরগতিতে হলেও খুব নিশ্চিত পদক্ষেপেই ঘটছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে এই অঞ্চলে লোহার লাঙলের প্রচলন হয়েছিল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে। সে যুগের তুলনায় নতুন পদ্ধতি কিন্তু বিস্তার লাভ করেছিল যথেষ্ট দ্রুতগতিতে। কারণ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষদিকেই সাতবাহন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। কৃষি উৎপাদনে কিছুটা স্বনির্ভর না হলে এমনটি সম্ভবপর হতো না। আরও দুই-তিন শতাব্দী পরে, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি বা তাঁর পরবর্তীকালে আমরা পাচ্ছি সমৃদ্ধ কৃষক, যাঁরা নিজেদের বলছেন 'হালিক', পাচ্ছি 'ধান্নিক'দের—যাঁরা ধানের ব্যবসা করতেন, বাস্তুব্যবসায়ীদের একটা সঙ্ঘের উল্লেখও পাচ্ছি। সেই সঙ্গে আছেন গ্রামীণ গৃহস্থ, যাঁরা নিজেদের বলছেন 'কুটুম্বিক'। এঁরা প্রত্যেকেই সম্পন্ন, বৌদ্ধমঠে দান করার মতো সঙ্গতি এঁদের ছিল বলেই এঁদের নাম এবং পেশাগত পরিচয় জানার সুযোগ আমাদের হয়েছে। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানারও সৃষ্টি হয়েছে তখন, তাই কেউ কেউ জমি দানও করেছেন। ধানচাষের সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটি ফলের চাষও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে, তা হলো নারিকেল। শতসহস্র নারিকেলগাছ-সহ ভূমিদানের উল্লেখও পাওয়া যাচ্ছে। লোহার ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে, তাই পাওয়া যাচ্ছে একাধিক লৌহবণিকের নাম। সব মিলিয়ে যে সমৃদ্ধি, তারই সূত্র ধরে এসেছেন গন্ধবণিকেরা, কিংবা পণ্যবহী সার্থবাহ। এঁদের উল্লেখও লিপিমালায় পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। কৃষি ও বাণিজ্যের যৌথ বিকাশই সাতবাহন রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তিটি রচনা করেছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক তথ্যের উল্লেখ করি। বণিক ও কৃষকদের যে নামগুলো লিপিপ্রমাণে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরা কেউই কিন্তু মাতৃগোত্র ব্যবহার করেননি। এর একটা কারণ হতে পারে, এঁরা এসেছিলেন পিতৃতান্ত্রিক

উত্তর ভারত থেকে। উত্তর কাছাড়ের ডিমাসা বা মিকির পাহাড়ের কাবি-রা (Karbi) নিজেরা লাঙল ব্যবহার করেন না, কিন্তু তাঁদের সমৃদ্ধ শ্রেণীটি সমতলীয় কৃষকদের দিয়ে আধুনিক প্রথায় চাষ করান। ঐ সমস্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ীরাও অধিকাংশই সমতলীয়।

উপজাতীয় সমাজের সমৃদ্ধ অভিজাত অংশটির সঙ্গে এঁদের সহযোগিতার সম্পর্ক বর্তমান। এই ধরনের একটা অবস্থা হয়তো দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাথমিক বিস্তারের পর্যায়ে বিরাজমান ছিল। স্থানীয় উপজাতীয়রাই সাত-বাহন রাজ্য বা তৎপরবর্তী রাজ্যগুলির অভিজাত সম্প্রদায়টি গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ভিত্তি হয়তো রচনা করেছিলেন বহিরাগত বণিক কৃষকরা। নতুবা এমনও হতে পারে যে স্থানীয়ভাবে অভ্যন্তরীণ বিবর্তন প্রক্রিয়াই বৈশিষ্ট্যটির জন্ম দিয়েছিল। অর্থাৎ সম্পদ ও জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এই সমস্ত পেশার ক্ষেত্রে যে সামাজিক আদর্শটি সৃষ্টি করেছিল, তারই ফলে এরা সর্বাগ্রে মাতৃগোত্র পরিহার করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে মাতৃগোত্র যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হচ্ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি কেউ কেউ তাঁদের পিতৃপরিচয়ে মাতৃগোত্র ব্যবহার করেছেন, কিন্তু নিজের পরিচয় মাতৃগোত্র বর্জিত। কিন্তু অভিজাতরা প্রায় সর্বত্রই মাতৃগোত্র ব্যবহার করেছেন, সম্ভবত বংশপরিচয়ের সঙ্গে এঁদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ তখনও বিদ্যমান ছিল।

সমসাময়িক কালের ধর্মাচার এবং দেব-কল্পনার যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাতেও একটু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাতবাহন লিপিমালায়ই সর্বপ্রথম আমরা সঙ্কর্ষণ বা বলরামকে দেবতারূপে পাচ্ছি, যার আয়ুধ লাঙল। এই ইঙ্গিতটিও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব তখনও পূর্ণমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তিনি তখন পর্যন্ত অন্য দশজন দেবতার অন্যতম মাত্র। বলরাম তাঁরই ভ্রাতা এবং সহচর। কৃষ্ণের রূপকল্পনার মধ্যে পশুপালন গোষ্ঠীর প্রভাব অনস্বীকার্য, সেক্ষেত্রে বলরাম এলেন কৃষিজীবীদের প্রতিভূ হিসাবে। লাঙলধারী কৃষিজীবীর সঙ্গে আদিম পদ্ধতির কৃষিজীবীর ধ্যান-ধারণার যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তা এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। আদিম কৃষিজীবীর ধর্মীয় ধারণায় নারীদেবতার স্থান সর্বোচ্চ, তিনিই শস্যজননী বা পৃথিবী। পশুপালক সমাজ সাধারণভাবে পুরুষদেবতার উপাসক। লাঙলের ব্যবহারের সঙ্গে পশুপালনের সংযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ, কারণ পশুপালনের অভিজ্ঞতা ব্যতীত ঐ ধরনের

চাষ সম্ভবপর নয়। সেই কারণেই মনে হয় লাঙলধারী একজন কৃষিদেবতার আবির্ভাব নিশ্চয়ই পশুপালক সমাজ থেকেই ঘটেছিল।

অর্থাৎ মূলত কৃষ্ণ এবং বলরাম দুজনেই ছিলেন পশুপালকশ্রেণীর দেবতা কিন্তু পশুপালকগোষ্ঠী লাঙলনির্ভর চাষে আগ্রহী হওয়ার পরই এই দেবভ্রাতৃদ্বয়ের যুগ্ম আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। আর্যরাও পশুপালক ছিলেন, এবং উত্তর ভারতে লাঙলভিত্তিক কৃষির প্রচলন তাঁরাই করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের আদি সাহিত্যে বলরামকে আমরা পাচ্ছি না। এতে মনে হয়, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের স্থানীয় কোনো কোনো পশুপালকগোষ্ঠী বেশ ব্যাপকভাবেই লাঙলনির্ভর কৃষিকাজে ব্যাপৃত হয়েছিল এবং এই অঞ্চলের কৃষিবিপ্লব মুখ্যত তাঁদেরই অংশগ্রহণের ফলে সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য তাঁরা উত্তর-ভারতীয় আদর্শ থেকেই নতুন উৎপাদন পদ্ধতির ধারণাটি লাভ করেছিলেন। স্থানীয় এই সমস্ত পশুপালকগোষ্ঠী লাঙলনির্ভর কৃষিকাজে আগ্রহী হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক রূপটিই যে আগাপাশতলা পালটে গেল—তাই নয়, গোটা দেশের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও তা যুগান্তর আনল। কৃষ্ণ-বলরামকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্ম এই অঞ্চল থেকেই গোটা দেশকে পরবর্তীকালে প্রভাবিত করেছিল।

কিছু পরবর্তীকালীন একটি প্রত্নলিপিতে এই কৃষিবিপ্লবের বাস্তব বিবরণ আমরা পেয়ে যাই। পল্লব বংশের একটি লিপিতে পাওয়া যাচ্ছে যে রাজা শিবস্কন্দের পিতা এক লক্ষ লাঙল প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।[৮০] সংখ্যাটা হয়তো অতিশয়োক্তি, কিন্তু এক লক্ষের জায়গায় কয়েক সহস্রও যদি হয়, তবু তো কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে কৃষিবিপ্লবের ক্রিয়াকাণ্ড তখনও পুরোদমে চলছে, বিশাল ভূখণ্ডকে আনা হচ্ছে নতুন কৃষিপদ্ধতির আওতায়, আর সে কাজে অঢেল রাজকীয় সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে। আরো উল্লেখযোগ্য যে, পল্লবদের রাজকীয় প্রতীক ছিল বৃষ, ঐ পর্যায়ের বৃহৎফলায়ন ও শালঙ্কায়ন রাজবংশের ক্ষেত্রেও তাই, আবার সেই সঙ্গে ওরা সবাই নিজেদের বলছেন 'শিবভক্ত'। অর্থনৈতিক আবহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সংযোগের চিত্রটাও এখানে যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আসলে, ঐ কৃষিবিপ্লব চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করার পরই ঐ অঞ্চলের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিবতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল। সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে উৎপাদনপদ্ধতির এই বিবর্তন যতখানি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিল, সুদূর দক্ষিণে তা হয়নি। সেখানে এর গতি ছিল শ্লথ। আর গুজরাট ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলেরও কিছু কিছু

উপজাতীয় সমাজ রয়ে গেল, যারা নতুন পদ্ধতিকে স্বাগত জানাতে না পারার দরুন চলে গেল গিরিকন্দরে বা অরণ্যে। কেউ কেউ আবার যাযাবরবৃত্তি ছাড়ল না, সমাজের নিম্নতম স্তরে আজ তাদের অবস্থান। কোসাম্বী এদের অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এই সমস্ত 'পিছিয়ে-পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বিবর্তন প্রক্রিয়া এখনও চলছে।[৮৬]

বৌদ্ধযুগের শুরুতে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল বলে ধরে নিলে সাতবাহনদের আবির্ভাবকালে সেই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বয়স ছিল মোটামুটি তিনশ বছর। এই গোটা সময়সীমাটাকেই আমরা ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কাল হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এই পরিবর্তনের হাত ধরেই প্রবেশ করেছিল নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন সামাজিক আদর্শ, পিতৃপ্রাধান্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাই যার অভীষ্ট ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছোবার আগে তার অনেকগুলি অন্তর্বর্তী পর্যায় ছিল, সাতবাহনদের মাতৃগোত্র ব্যবহার সেই পর্যায়গুলিরই অন্যতম। ঐ অঞ্চলের উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের যে কালপর্যায় নিরূপণ করা সম্ভব, তাতে সাতবাহন আমলকে আমরা সেই পরিবর্তনশীল যুগের মধ্যবর্তী পর্যায় হিসাবে অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারি। এবং মাতৃগোত্রের ব্যবহার-সহ মাতৃপ্রাধান্যের বিভিন্ন স্মারকের অস্তিত্ব সে যুগের অর্থনৈতিক পটভূমির সঙ্গে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সে ধারণা সম্পূর্ণ সুসঙ্গত বলেই মনে হয়।

৮

এবার আমরা উপনিষদের মধ্যে মাতৃগোত্রে বা মাতৃপদবীধারী যাঁদের উল্লেখ রয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি। উপনিষদ রচিত হয়েছিল উত্তর ভারতে, এবং আমরা যেরূপে এগুলোকে পাচ্ছি, তার কোনোটারই রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর আগেকার নয়। এগুলি রচিত হয়েছিল পুরুষপ্রধান সমাজে, যে আর্য মানসিকতা উপনিষদে বিধৃত, তাঁরা ছিলেন মূলত পশুপালক এবং ঋগ্বেদের যুগেই তাঁরা লাঙলনির্ভর কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যে লাঙলের ফলা হয়তো কাষ্ঠনির্মিত ছিল, কিন্তু মোটামুটি খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর আগেই লৌহনির্মিত লাঙলের ব্যবহার উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল।[৮৭] উপনিষদের যুগে শাসক হিসাবে রাজাদের বিস্তর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো-বা সে রাজাদের রাজ্যসীমা তেমন বিস্তৃত ছিল না। ব্যক্তিগত

সম্পত্তি সম্পর্কে ধারণা এবং আসক্তি তখন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। পশুপালক গোষ্ঠী হিসাবে পিতৃপ্রাধান্যের ব্যাপারটি তাঁদের আদিম জীবনধারার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল, লাঙলনির্ভর কৃষি তাকে আরো সার্বিক রূপদান করে। উত্তর-ভারতীয় অন্য যে-সমস্ত গোষ্ঠীকে তারা ইতিমধ্যেই আত্মস্থ করেছিল, তারা ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে আর্য আদর্শকেই গ্রহণ করে নিয়েছিল।

কিন্তু আত্তীকরণের প্রক্রিয়াটা কোনো সময়েই একমুখী প্রবাহ হয় না, তার মধ্যে একটা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার অন্তর্লীন থাকে। পশুপালক আর্যরা উত্তর ভারতে যাদের সংস্পর্শে এসেছিল, তাদের অগ্রসর অংশটি নিশ্চিতই ছিল কৃষিজীবী। সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে-সমস্ত সাক্ষ্য পাওয়া গেছে, তাতে এ তথ্য প্রমাণিত যে এ সভ্যতার ধারকদের অর্থনীতি ছিল মুখ্যত কৃষিনির্ভর। কোসাম্বী অনুমান করেছেন যে সেখানে লাঙল ব্যবহৃত হতো না, যদিও ভারী কোদালজাতীয় খোন্তের খননযন্ত্র নিশ্চয়ই কাজে লাগানো হতো।[৮৮]

কোসাম্বীর মতে নদীর বালুকাময় অববাহিকা অঞ্চলে কোদালের সাহায্যেই পর্যাপ্ত উৎপাদন সম্ভবপর ছিল, সেই কারণেই ঐ উন্নত পর্যায়ের সভ্যতা লাঙলজাতীয় বস্তুর আবিষ্কারে সক্ষম হয়নি। তদুপরি মহেঞ্জোদারো-হরাপ্পার অধিবাসীরা লোহার ব্যবহার জানতেন না। ফলে অনুমান করা যায় যে ঐ সভ্যতার স্রষ্টাদের সামাজিক সংগঠন মাতৃপ্রাধান্যের অনুকূল ছিল। ব্যাপক মাতৃমূর্তির অস্তিত্বের যে প্রমাণ ঐ সমস্ত অঞ্চলে পাওয়া গেছে, তাতেও এই ধারণা সমর্থিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা দরকার যে সিন্ধু সভ্যতায় আমরা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অস্তিত্বের প্রমাণ পাচ্ছি, নগর পরিকল্পনার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বাক্ষরও পাওয়া যায়, সাক্ষ্য পাওয়া যায় বেশ সমৃদ্ধ ধরনের সামুদ্রিক বাণিজ্যের। অতএব নির্ভেজাল উপজাতীয় মাতৃপ্রাধান্য এই ধরনের সমাজে বিরাজিত ছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত। কিন্তু মাতৃপ্রাধান্যের যেটুকু লক্ষণ আমরা সাতবাহন যুগে বর্তমান দেখি, সিন্ধু সভ্যতায় সে আদর্শের প্রভাব আরেকটু ব্যাপক এবং গভীর ছিল, এমন অনুমান করা চলে। আর ঐ সমাজের নাগরিক অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর রসদ জোগাত যে গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজ, তারা নিশ্চয়ই প্রাচীন সামাজিক আদর্শের অনুসরণে আরেকটু বেশি নিষ্ঠাবান ছিল। পরবর্তীকালের খননে ঐ আমলের অনেকগুলি গ্রামীণ বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে, যার কৃষিজীবী অধিবাসীরাই ছিল ঐ সভ্যতার সমৃদ্ধির মূল ভিত্তির যোগানদার। প্রাচীন কৃষিপদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনই এদের উপজীবিকা ছিল এবং জমির পেলবতা ও উর্বরতার সুযোগে যেটুকু উদ্বৃত্ত শস্য এদের ঘরে

উৎপন্ন হতো, তার সবটুকুই সম্ভবত নাগরিক শাসকশ্রেণী আত্মসাৎ করে নিতেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হওয়ার সুযোগ সীমাবদ্ধ থাকায় মাতৃপ্রাধান্যের ধারণাকে যথাসম্ভব অটুট রাখার ব্যাপারে এই ধরনের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সংগঠন ছিল খুবই উপযোগী। পিতৃপ্রাধান্যে বিশ্বাসী আর্যরা এই ধরনের মাতৃপ্রধান কৃষিজীবী স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে অনেকখানি অগ্রসর হওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ের উপনিষদগুলি রচিত হয়েছিল। উপনিষদে উল্লিখিত মাতৃগোত্র সম্পর্কে আলোচনার সময়ে এই তথ্যগুলি আমাদের স্মরণে রাখার প্রয়োজন পড়বে।

প্রথমে ঐতরেয় উপনিষদের কথা ধরা যাক। ঐ উপনিষদের রচয়িতা হিসাবে যিনি পরিচিত, তাঁর নাম বলা হচ্ছে ঐতরেয় মহীদাস। মহীদাসের ঐতরেয় অভিধাটি এসেছে তাঁর মাতৃনাম 'ইতরা' থেকে। মহীদাস মাতৃনাম কেন ব্যবহার করতেন এ নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত রয়েছে। ইতরার স্বামী ছিলেন একজন ঋষি। তাঁর সংস্রব ব্যতিরেকেই ইতরা গর্ভবতী হন। ক্রুদ্ধ স্বামীর কাছে ইতরার কৈফিয়ৎ ছিল যে দেবতার বরেই তিনি সন্তান-সম্ভবা হয়েছেন। স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেন এবং স্বামী পরিত্যক্তা মাতাই মহীদাসকে লালন করেন। পিতৃ-পরিচয়হীন মহীদাস তাই মাতৃপরিচয়কেই বরণ করে নেন।

পুরো গল্পটাই একটা রূপক, কিন্তু রূপকের মধ্যে ইতিহাস ও সমাজগত যে সত্যটি নিহিত রয়েছে, তার ইঙ্গিতগুলি লক্ষণীয়। মহীদাস ভূমির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ কৃষিজীবী মানুষের প্রতিভূ। তার মাতা ইতরা, উচ্চবর্ণের আর্যসমাজ এই দৃষ্টিতেই আদিম কৃষিজীবী গোষ্ঠীর নারীদের দেখত। ঐতরেয় উপনিষদকে আজকে আমরা যে আকারে পাচ্ছি, তাতে অবশ্য পরবর্তী মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণাই উপস্থাপিত। তবু মনে হয় ঐতরেয় উপনিষদ তার আদি পর্যায়ে সম্ভবত মাতৃপ্রধান কৃষিজীবী সমাজের জীবনদর্শনকেই ব্যক্ত করেছিল। পরবর্তীকালে নতুন আদর্শে পুনর্লিখনের সময়ে হীনকুলোদ্ভব ইতরা এবং তার মাতৃপদবীধারী পুত্রের স্মৃতিকে যে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা সম্ভব হয়নি, তাতে মনে হয় এ-দুটি নামের সঙ্গে কৃষি-জীবী সমাজের যে জীবনদর্শনটি সংশ্লিষ্ট ছিল, লোকসমাজে নিশ্চয়ই তা প্রভাব হিসাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। তাই নামদুটি শীলমোহর হিসাবে অক্ষুণ্ণ রেখে সেই দর্শনের অন্তর্বস্তুকে পালটে দেওয়া হয়েছিল। জনপ্রিয় গ্রন্থ বা তার রচয়িতার নামটি অপরিবর্তিত রেখে সম্পূর্ণ বক্তব্য বদলে দেওয়া অথবা আংশিকভাবে অন্য বক্তব্য অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া—এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে এ ধরনের কৌশল

গ্রহণের পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে : এ ধরনের কৌশলের সামাজিক কার্যকারিতা নতুন নামে নতুন বক্তব্য প্রচারের চাইতে বেশি ছিল।

ঐতরেয় উপনিষদের কোনো কোনো অংশে তার আদি বক্তব্যের কিছু কিছু ইঙ্গিত এখনও খুঁজে বের করা যায়। যেমন, প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা পাই মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির দুশ্চিন্তা "অশনায়া-পিপাসে তম অব্রূতাম, আবাভ্যাম অভিপ্রজানীহি ইতি" (অতঃপর ক্ষুধাতৃষ্ণা ঈশ্বরকে বলিল, 'আমাদের জন্যও আবাসস্থান চিন্তা করুন)। ঈশ্বর সে চিন্তা থেকেই সৃষ্টি করলেন অন্নের, সে অন্ন কিভাবে মানবদেহ গ্রহণ করবে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হলো — প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে সে-বর্ণনাও একটু বিস্তৃতভাবেই রয়েছে। উপনিষদের অকৃত্রিম ভাববাদী আবহে এ চিন্তাগুলো একদিকে বেমানান, যদি-না ধরে নিই যে আদিম কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর পার্থিব ক্ষুধাতৃষ্ণার সঙ্গে সম্পৃক্ত বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনার কিছু অবশেষ এখানে টিঁকে রয়েছে।

ঐতরেয় উপনিষদের অন্যান্য অংশে এমন ধরনের চিন্তার আর তেমন কোনো স্বাক্ষর নেই, কিন্তু এর মূল বক্তব্যের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব দু-এক জায়গায় অনায়াসে লক্ষ করা যায়। যেমন অন্ন সংক্রান্ত বক্তব্য শেষ হওয়ার পরই যে অংশটি রয়েছে, তাতে পরমেশ্বরকে স্বগত চিন্তায় মগ্ন হিসাবে দেখানো হয়েছে। সেই চিন্তার স্বরূপটি উল্লেখযোগ্য : "যদি বাগিন্দ্রিয়ই শব্দ উচ্চারণ করিল, যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই গন্ধ গ্রহণ করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি কর্ণই শুনিল, যদি মনই চিন্তা করিল, যদি ত্বকই স্পর্শ করিল, যদি অপানই মলত্যাগ করিল, যদি জননেন্দ্রিয়ই শুক্রত্যাগ করিল — যদি এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের সকল কার্যই আমি ছাড়াই সম্পন্ন হয়, তবে আমি কে, অর্থাৎ দেহের সহিত আমার কি সম্বন্ধ রহিল।" এটি স্বয়ং পরমেশ্বরেরই স্বগতোক্তি এবং দাঁকায় যে সমস্যাটা তার পক্ষে খুবই গুরুতরও বটে। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি যদি নিজেই নিজের কাজগুলি সম্পাদন করে নেয়, তবে তো ঈশ্বর সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়েন। দেহের সঙ্গে তখন আত্মা বা ব্রহ্মের সংযোগ কল্পনারই প্রয়োজন কি ?

উপনিষদের ভাববাদী মতাদর্শের যারা প্রবক্তা, এই প্রশ্নগুলি নিশ্চয়ই তাদের পরিকল্পিত নয়। প্রশ্নটি যেভাবে উত্থাপিত, তাতে মনে হয় অদৃশ্য একটি পূর্বপক্ষ পরিকল্পনা করে সেই পূর্বপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। কে এই পূর্বপক্ষ ? বলা প্রয়োজন যে ভারতের দর্শনচিন্তার ইতিহাসে এই পূর্বপক্ষের পরিচয় একেবারে অনুল্লিখিত নয়। এই দার্শনিকদের বলা হতো

লোকায়তিক। লোকায়ত দর্শনের বিভিন্ন ধারা ছিল, কিন্তু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকায়ত দর্শন' (প্রথম সংস্করণ) বইয়ে তার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ নিরূপণ করেছেন :

১. লোকায়ত দর্শন মূলত প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী দর্শন।

২. এই দর্শনের জন্ম এবং বিকাশ ঘটেছিল আদি কৃষিজীবী সমাজের মধ্যে।

৩. আদি কৃষিজীবী সমাজ মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবাধীন ছিল।

৪. শস্যপ্রসবিনী ভূমি এবং সন্তানপ্রসবিনী নারীর সাদৃশ্যকল্পনা এই দর্শনের অঙ্গ ছিল।

৫. এই দর্শন ছিল মূলত দেহবাদী ও বস্তুবাদী, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাকে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যান করত।

৬. বামাচারী তান্ত্রিক চিন্তাধারার মধ্যে লোকায়ত দর্শন কিছুটা পরিবর্তিত এবং অনেকটাই বিকৃতরূপে টিঁকে রয়েছে।

কৃষিজীবী সমাজের মাতৃপদবীধারী ঐতরেয় মহীদাস যদি সত্যিই কোনো সামাজিক-দর্শনচিন্তার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, তবে তা নিশ্চয়ই লোকায়ত দর্শন, এবং তার নামে প্রচারিত দর্শন আদিতে হয়তো সেই দর্শনচিন্তাকেই সাধারণো বিস্তৃত করেছিল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রয়োজনে এই দর্শন-চিন্তার অন্তরকে পালটে নিয়ে তাকে যখন অধ্যাত্মবাদী উপনিষদে পরিণত করা হলো, তখন তাই দেহ, ইন্দ্রিয় এবং আত্মার মধ্যেকার সম্বন্ধবিষয়ক লোকায়িত মতের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ ঐতরেয় দর্শনের আদিম রূপটিকেই পূর্বপক্ষ হিসাবে ধরে নিয়ে লোকায়তিক মতবাদ-পন্থত এই সমস্ত প্রশ্ন খণ্ডন করার জন্য পরমেশ্বরীয় এই বগত চিন্তার অবতারণা।

৯

ছান্দোগ্য উপনিষদে মাতৃপদবীধারী আরেকজন ঋষির কাহিনী আমরা পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতার কল্যাণে জবালাপুত্র সত্যকাম জাবালের কাহিনী আজ সুপরিচিত। ইতরাপুত্র মহীদাসের জন্মবিবরণ উপনিষদে লিপিবদ্ধ নেই, কিন্তু সত্যকাম জাবালের জন্মবৃত্তান্ত উপনিষদেরই অঙ্গ। মাতা জবালা সত্যকামকে স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে তিনি সত্যকামের গোত্রপরিচয় জানেন না, কারণ বহু বছর পরিচর্যা করে তিনি তাকে পেয়েছেন।

মন যখন সংস্কারবদ্ধ থাকে তখন অতি সাধারণ কথার অর্থ উপলব্ধিতে অতি

বিদ্বজ্জনেরও কিরকম বিভ্রম ঘটে, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে এই উপাখ্যানের শঙ্করাচার্য-কৃত ব্যাখ্যায়। শঙ্করাচার্য সত্যকামের পিতৃপরিচয় সম্পর্কে জবালার এই স্বীকারোক্তিকে এই বলে ব্যাখ্যা করেছেন যে সময়াভাব এবং লজ্জাবশতই নাকি জবালা স্বামীকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন না। অথচ জবালার বক্তব্যের মধ্যে এ ধরনের কষ্ট-কল্পনার কিছু অবকাশই নেই। তার বক্তব্য স্পষ্ট এবং সরল, যৌবনে বহু মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তৃপ্ত করেছেন বলেই সত্যকামের সঠিক পিতৃপরিচয় তার পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। সত্যকাম নিঃসংকোচে এই মাতৃকলঙ্ক প্রকাশ করেছেন বলেই হারিদ্রুমত গৌতম তার সত্যভাষণের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

জবালা যত নিঃসংকোচেই তাঁর প্রাক্‌জীবনের কথা ব্যক্ত করুন না কেন, গৌতম ঋষির আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পিতৃপরিচয় না থাকাটা সত্যকামের পক্ষে লজ্জার কারণ ছিল। অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রচিত, কিন্তু সমান্তরালভাবে মাতৃপ্রাধান্য কোথাও কোথাও তখনও টিঁকে ছিল। মাতৃপদবীধারী সত্যকাম সেই ধরনের সমাজব্যবস্থারই প্রতিনিধি, জবালার স্বীকৃতির মধ্যেও তাই কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। সেই সঙ্গে বহু মানুষের পরিচর্যার কথাটাও খুব একটা সংকোচের সঙ্গে বলা হয়নি। কোন ধরনের সমাজব্যবস্থায় বহু মানুষকে দেহদান করার কথা এমনই নিঃসংকোচে বলা সম্ভব?

প্রাচীন দেবী উপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক জাতির মধ্যেই কন্যাকে দেবী-মন্দিরে নিয়োজিত করার প্রথা ছিল। এই সমস্ত কন্যারা দেবীর প্রধানাপূজারিণীর সহকারিণী হিসাবে কাজ করতেন এবং মন্দিরে আগত পূজার্থীদের সম্ভোগ-বাসনাকে চরিতার্থ করা এদের কর্তব্যকর্মের অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হতো। ব্যাবিলনে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি ফলক পাওয়া গেছে, যাতে দেবী ইসথারের পূজারিণীদের সঙ্গে পূজার্থীদের সম্বন্ধের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে যে পূজারিণীরা পূজার্থীদের দেবতার প্রতীক হিসাবে বরণ করত।[১৯] মেরলিন স্টোন এ-ধরনের আরও বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। যেমন, পশ্চিম এনাতোলিয়াতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে অরেলিয়া এমিলিয়া নাম্নী মহিলার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যিনি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে তিনি নিজে, তাঁর মাতা এবং মাতামহী, এঁরা সবাই দেবী-মন্দিরে এই ধরনের দেহদান ব্রতে অংশগ্রহণ করেছিলেন,[২০] সুমেরের প্রাচীনতম লিপি থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই প্রথার ব্যাপক অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন।[২১] সেখানে বলা হয়েছে যে দেবী ইনান্না ইরেকের অধিবাসীদের সুসভ্য করার জন্য

এই রীতি প্রচলিত করেছিলেন। একটি প্রাচীন ফলকে রয়েছে যে দেবী ইনান্না পূজারিণী লিলিথকে পথিপার্শ্ব থেকে সঙ্গকামী পুরুষদের মন্দিরে ধরে নিয়ে আসতে আদেশ করছেন। গ্রীসে ক্লাসিক্যাল যুগের এ প্রথার অস্তিত্ব ছিল।[২২] করিন্থে অ্যাক্রোদিতির মন্দিরে এই প্রথা ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেও লুসিয়ান সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে অ্যাডোনিসের উৎসবের দিনে অপরিচিত মানুষের কাছে দেহদান করাকে রীতি বলেই মেনে নেওয়া হতো। স্ট্রাবো নিজের জীবদ্দশাতেই এশিয়া মাইনরের কিছু কিছু এলাকায় দেবী মন্দিরে এই ধরনের দেহদানের রীতি প্রত্যক্ষ করেছেন।[২৩] আরো অজস্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়, কিন্তু আমাদের কাজটুকু এতেই চলবে। দেখা যাচ্ছে প্রাচীন দেবীপূজার কেন্দ্রগুলোতে পূজারিণী নারীরা অপরিচিত পুরুষদের দেহদান করাটাকে ধর্মাচারের অঙ্গ বলে মনে করতেন, এর সঙ্গে লোকলজ্জা বা পাপবোধের কোনো সংস্রবই ছিল না।

আমাদের দেশের দেবদাসী প্রথাও যে এই ধরনের ধর্মাচারের সঙ্গে আদিতে সংশ্লিষ্ট ছিল, তা জে. এইচ. হাটন[২৪] এবং কোসাম্বী[২৫] দেখিয়েছেন। সাতবাহন লিপিমালায় গণিকাপুত্র ও বেশ্যাপুত্র অভিধা যে অনায়াসে ব্যবহৃত হয়েছে, তার উল্লেখ আমরা আগে করেছি। অন্ধ্র অঞ্চলে প্রতিটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষকে যে আজও লাঞ্জাডিব্বা বা ভোগাম ও নীডিব্বা বলা হয়, তাও অর্থবহ। ঐ শব্দ দুটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে গণিকাবাস।[২৬] অথচ দেবদাসীদের সম্মান, এমনকি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও, নিতান্ত কম ছিল না। উড়িষ্যার যাজপুরের রাজা কর্ণ সলোমপুর মহাবিহারের বৌদ্ধমন্দিরের দেবদাসী কর্পূরশ্রীকে রানী করেছিলেন। যে ফলকটিতে এই সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে কর্পূরশ্রীর মাতা ও মাতামহীর নাম রয়েছে, কিন্তু পিতা বা পিতামহের উল্লেখ নেই। দীনেশচন্দ্র সরকারের ভাষায়, "দেবদাসীকন্যার পিতৃপিতামহের পরিচয় না থাকারই কথা।"[২৭]

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় এবং পশ্চিম এশীয় জাতিগুলির প্রাচীন রীতিনীতির মধ্যে দেবীপূজা-সংক্রান্ত যে-সমস্ত আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, ভারতবর্ষেও যে সমজাতীয় আবহ বর্তমান ছিল, দেবদাসী প্রথার অস্তিত্ব তারই দ্যোতক। জবালা সম্ভবত ছিলেন সেই ধরনের পূজারিণী-ঐতিহ্যেরই প্রতিভূ, বহুচারিতার মধ্যে লজ্জা-সংকোচের কোনো কারণ তাই তিনি খুঁজে পাননি। 'বহু অহম্ চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে' (যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহুলোকের পরিচর্যা করে)—অতি সহজ সরল সত্যভাষণ, পিতৃপ্রধান সমাজের সতীত্বের ধারণার কোনো অভিজ্ঞান এর মধ্যে নেই। ঐতিহাসিক স্ট্রাবো নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা

দিতে গিয়ে যা বলেছেন, মেরলিন স্টোন তার উল্লেখ করেছেন, "He wrote that in his travels he had witnessed that the children who were born in this way were considered to be legitimate and respectable and simply given the name and social status of the mother.... Inherent within the very practice of the sexual custom was the lack of concern for the paternity of children."[১৮] স্ট্র্যাবোর প্রবন্ধক এই বক্তব্যের সঙ্গে গোত্রপরিচয়ের প্রসঙ্গে জবালার বক্তব্য ও মনোভাবের সাদৃশ্য বিস্ময়কর : "আমি জানি না তোমার কি গোত্র। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম, তাই বলিও তুমি সত্যকাম জাবালা।" এই উত্তরের মধ্যে আরেকটি প্রশ্নও চকিতে ঝলকে ওঠে, 'সত্যকাম' এই নামটির মধ্যে কোনো গূঢ় ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে কী?

১০

সত্যকাম জাবালের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল জন্মানো স্বাভাবিক। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা সত্যকাম জাবালের দার্শনিক উপলব্ধির যে বিবরণ পাচ্ছি, তা অন্যান্য উপনিষদের সাধারণ ধারা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। গুরুগৃহে সত্যকাম যে বিদ্যালাভ করেছিলেন বলে বিবরণ রয়েছে তা ভাববাদী ব্রহ্মবিদ্যা। কিন্তু সত্যকাম কর্তৃক প্রচারিত নিজস্ব দর্শনচিন্তা যে নিছক ভাববাদী ছিল না, তার কিছু বিক্ষিপ্ত আভাস ছান্দোগ্য উপনিষদে রয়েছে। বিবরণে পাওয়া যায় প্রবাহন জৈবলি উদ্দালক আরুণিকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রবাহন জৈবলি নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে ইনি সত্যকাম জাবালের অপত্য কিংবা শিষ্য ছিলেন। উপনিষদে আছে জৈবলি উদ্দালক আরুণিকে এমন এক বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন, যে বিষয় সম্পর্কে আরুণির নিজস্ব কোনো জ্ঞান ছিল না। প্রবাহণ জৈবলি বলেছেন যে এ বিষয়ে এর আগে অন্য কোনো ব্রাহ্মণই উপদিষ্ট হন নি। বলা প্রয়োজন যে প্রবাহন জৈবলির জাতিপরিচয় দেওয়া হয়েছে ক্ষত্রিয় বলে, আবার আরুণিপুত্র শ্বেতকেতু এমন ইঙ্গিতও করেছেন যাতে তার ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

যাই হোক, প্রবাহণ জৈবলি যে জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন, তার কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

'সেই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। সেই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে অন্ন

উৎপন্ন হয়। সেই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। হে গৌতম, নারী অগ্নি, উপস্থ তাহার সমিধ, যে সম্ভাষণ করে, তাহাই ধূম। জননেন্দ্রিয় অর্চি, মৈথুন অঙ্গার, এবং সমস্থখই স্ফুলিঙ্গ। সেই স্ত্রীরূপ অগ্নিতে দেবগণ শুক্রকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে গর্ভসঞ্চার হয়।"

এই অংশটুকুও ভাববাদী দর্শনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, তবু মনে হয় যে জাবাল-দর্শনের আদি স্বরূপটির কিছুটা আভাস এর মধ্যে ধরা পড়েছে। বৃষ্টির আবাহন কৃষিজীবী সমাজের একটি অবশ্যপালনীয় ক্রিয়া। শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তাকে আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করাও কৃষিজীবী সমাজেরই রীতি। আবার সন্তান প্রজনন এবং শস্য উৎপাদনকে সমজাতীয় প্রাকৃতিক ক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা যে লোকায়তিক সমাজেরই একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। সবচাইতে বড়ো কথা হচ্ছে—অগ্নিকে স্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবৈদিক। অগ্নি পরাক্রমশালী বৈদিক দেবতা, বরঞ্চ তার স্খলিত বীর্য যে-কোনো নারীই ধারণ করতে সক্ষম নন, সে কথাটাই পরবর্তী পুরাণ-কাহিনীতে বারবার জোর দিয়ে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'স্ত্রীই অগ্নি' এবং দেবগণের শুক্র তাতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, এমন পরিকল্পনা নিশ্চিতই কোনো অবৈদিক ঐতিহ্য থেকে এসেছে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রবাহণ জৈবলি আবার তার আগেকার বক্তব্যে সারসংক্ষেপ করে বলছেন:

"ধূম হইতে অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে। তারপর তাহারা এই পৃথিবীতে ব্রীহি ও যব, ওষধি ও বনস্পতি, তিল ও মাষ—এই সব জন্মায়। এই অবস্থা দুর্নিষ্ক্রমণীয়। যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে, তাহারা রেতঃ-সিঞ্চন করে" ইত্যাদি।

প্রবাহণ জৈবলি এখানে শুধু অন্ন বলছেন না, ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ ইত্যাদি বহুপ্রকারের কৃষিজাত উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। উপনিষদের ব্যাখ্যাকারেরা 'অন্ন' শব্দের নানা রকমের আধ্যাত্মিক অর্থ করে থাকেন, কিন্তু ব্রীহি, যব, মাসকলাই, তিল ইত্যাদি নিতান্তই বস্তুজগতের উপাদান, এগুলোর উপর আধ্যাত্মিকতা আরোপ করা খুবই কঠিন। এগুলো নিয়ে আলোচনা সম্ভব শুধুমাত্র কৃষিজীবী সমাজ-প্রসূত দর্শনেই। প্রবাহণ জৈবলি যদি সত্যকাম জাবালের উত্তরসূরী হিসাবে জৈবলি নামটি বহন করে থাকেন, অন্যরকম হওয়ার কারণ নেই, তাহলে বলব সত্যকাম জাবালের বিদ্যাভ্যাস পর্বটিকে ব্রহ্মবিদ্যার আবরণে মুড়ে

কেননা সম্ভব হলেও জাবালা-দর্শনের মূল উপাদান কিছু অন্তত টিঁকে রয়েছে প্রবাহণ জৈবলির বক্তব্যের মধ্যে।

উপনিষদের বাইরে জাবাল-দর্শনের উল্লেখ আমরা পাই রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে। বনবাস থেকে রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের সঙ্গে জাবালি বলে একজন ঋষিও গিয়েছিলেন (সাহিত্যিক পরশুরাম এ নিয়ে একটি সুন্দর গল্প লিখেছেন, গল্পের নাম 'জাবালি')। এই জাবালিও নিঃসন্দেহে সত্যকাম জাবালেরই উত্তরসূরী। রামচন্দ্রকে প্রত্যাগমনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাবালি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তা সম্পূর্ণই বস্তুবাদী বক্তব্য, সমস্ত ধরনের আধ্যাত্মিক ভাববাদকেই সেখানে নস্যাৎ করা হয়েছে। বোঝা যায়, রামায়ণ রচনার যুগেও জাবালপন্থীদের লোকায়ত দর্শনের প্রবক্তা হিসাবে ধরে নেওয়া হতো। সত্যকাম জাবালের মাতৃ-পদবীর উৎস নির্ণয়ের সময়ে আমরা যদি এ কথাটা মনে রাখি যে লোকায়ত দর্শন মূলত ছিল মাতৃতান্ত্রিক আদিম কৃষিজীবী সমাজের জীবনদর্শন, তাহলে অনেক বিভ্রান্তির জট ছাড়িয়ে সমস্যাটির সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে আর কোনো অসুবিধে থাকে না।

এতক্ষণ আমরা বিচ্ছিন্নভাবে মাতৃপদবীধারী দুজন উপনিষদকারের কথা আলোচনা করলাম। বৃহদারণ্য উপনিষদের একেবারে শেষ অধ্যায়ে আমরা কিন্তু একই সঙ্গে ছত্রিশজনের একটা তালিকা পাচ্ছি, যারা সকলেই মাতৃপদবীধারী। নামগুলির মধ্যে রয়েছে পৌতিমাষীপুত্র, কাত্যায়নীপুত্র, গৌতমীপুত্র, ভারদ্বাজী-পুত্র, পারাশরীপুত্র, কৌশিকীপুত্র ইত্যাদি। এতগুলি মাতৃপদবীধারী নামের সমাবেশ বৃহদারণ্য উপনিষদের পরিশিষ্টে প্রায় প্রক্ষিপ্তের মতো সন্নিবিষ্ট হলো কেন, সে প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়। একটি তথ্য তো খুবই সুস্পষ্ট যে মাতৃগোত্রধারীদের একটি বিস্তৃত সমাজের অস্তিত্বের সাক্ষ্য এই তালিকাটি বহন করছে এবং সে সমাজ বিদ্যমান ছিল ঔপনিষদিক উত্তর ভারতেই। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, ঐ তালিকায় যে পদবীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তার অধিকাংশই বৈদিক গোত্রপিতার বা সুপরিজ্ঞাত বৈদিক ঋষির নামের স্ত্রীলিঙ্গান্বিত রূপ বলেই প্রতিভাত হয়। সাতবাহন যুগে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে এমনি মাতৃগোত্রধারীদের ব্যাপক সামাজিক সংগঠন যে মহিমান্বিত রূপে বিরাজমান ছিল, তা আমরা দেখেছি। তথ্যগুলি থেকে দুটি প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথমত, সুদূর অতীতে কী উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত একটি বিস্তৃত মাতৃগোত্রধারী সমাজের অস্তিত্ব ছিল? সাতবাহনরা কী সেই ধারারই লুপ্তপ্রায় অবশেষ? দ্বিতীয়ত, বৈদিক গোত্রপিতা বলে পরবর্তীযুগে যারা

স্বীকৃত, তাঁরা কি মূলত মাতৃগোত্রেরই ধারক ছিলেন ? অর্থাৎ গোত্রমাতারা কী পিতৃতান্ত্রিকতার পরবর্তী প্রবাহের চাপে গোত্রপিতায় রূপান্তরিত হয়েছেন ?

এই মুহূর্তে অনায়াস ক্ষিপ্রতায় প্রশ্ন দুটির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু প্রশ্ন দুটিকে সামনে রেখে এদেশের সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন সম্পর্কে আরো ব্যাপক এবং সচেতন অনুসন্ধানের অবকাশ যে রয়েছে, একথা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না।